Contents

ষষ্ঠ বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।।০

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

ষষ্ঠ বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

১৩৭৫ হিঃ ; অগ্রহায়ণ, বাং ১৩৬২ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত আলফাতিহার তফছীর	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	১৯৯
২। জাতীয়তার স্বরূপ ও আদর্শ	ঐ	২০৭
৩। "নিজামুল-মুল্ক"	সগির এম, এ,	২১১
৪। আগে চল আমছার (কবিতা)	কাজী গোলাম আহমদ	২১৬
৫। পশ্চিম পাকিস্তানে চব্বিশদিন	অধ্যক্ষ মুহম্মদ আযীমুদ্দীন	২১৭
৬। মুছলিম শিক্ষার ধারা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২২২
৭। পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য সমস্যা	অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী	২২৯
৮। আদর্শ মানব	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২৩২
৯। ঈদে-মীলাদুন্নবী	ডক্টর মোহাঃ আবদুল বারী (এম-এ, ডি-ফিল-অক্সন)	২৩৬
১০। বিশ্ব পরিক্রমা	সহকারী সম্পাদক	২৩৯
১১। ইছলামী শাসন-সংবিধান সম্পর্কে পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের আধুনিক কার্যতৎপরতা	সম্পাদক	২৪৩
১২। সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়)	ঐ	২৪৮
১৩। রুশ নেতার বিবৃতির প্রতিবাদ	ঐ	২৫০
১৪। বন্যার্তদের খেদমতে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীছ	সেক্রেটারী	২৫০

অনতিবিলম্বে বাহির হইতেছে—

জনাব হযরত মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের দীর্ঘদিনের বিরামহীন সাধনার অমৃতময় ফল—

নবী মোস্তফার (দঃ) বিশ্বজনীনতা ও চরমত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বঙ্গ ভাষাভাষীগণের খেদমতে অনুপম ছওগাত—

সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ—

নবুওতে-মোহাম্মদী

(১ম খণ্ড)

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

ষষ্ঠ বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত্‌ আল-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৩৫)

আবাদীয়তের পূর্ণ প্রতীক ইবরাহীম খলীলুল্লাহ

আল্লাহর আবাদীয়তের সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং বিশিষ্ট যে আসন, হযরত ইবরাহীম (দঃ) সেই বিশিষ্ট আসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁহার স্থান যেরূপ অনবদ্য তেমনই তাঁহার পবিত্র জীবনাদর্শও মহান ও অভূতপূর্ব। তৎকালীন জগতের বিশিষ্ট ভূখণ্ড গুলি যখন জড়বাদ ও বহু-ঈশ্বরবাদের সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল সেই সময়ে তওহীদ, অবুদীয়ত ও একনিষ্ঠার সমুজ্জ্বল প্রতীক রূপে হযরত ইবরাহীম সত্যপরায়ণ ও সত্যজীবীগণের অধিনায়ক হইয়া ধরাধামে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ণ-আবাদীয়তের স্বীকৃতি স্বয়ং মা'বুদ কর্তৃক কোরআনের মাধ্যমে বিঘোষিত হইয়াছে, و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن' قال انى جاعلك للناس اماما' قال و من এবং যখন ইবরাহীম-কে তাঁহার রব্ব কতকগুলি বিষয়ে পরীক্ষা করিলেন

এবং সেই সকল পরীক্ষায় ইবরাহীম উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন, তখন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—আমি তোমাকে মানব সমাজের নেতৃত্ব প্রদান করিব। ইবরাহীম নিবেদন করিলেন, আমার বংশধরগণও যেন এই নেতৃত্বের অধিকারী হইতে পারে! আল্লাহ বলিলেন, সীমালংঘনকারীগণ আমার প্রতিশ্রুতির ফল ভোগ করিতে পারিবেনা —আল্‌বাকারা ১২৪ আয়ত। ذريتى، قال : لا ينال عهدى الظالمين -

ইহা লক্ষ করার বিষয়, এই আয়তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি শুধু বিশ্বাস-পরায়ণগণ এবং আবাদীয়তের সীমা রক্ষাকারীগণের জন্যই নির্দিষ্ট। যাহারা অনাচারী এবং আল্লাহর আইনের লংঘনকারী, তাহাদের আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব এবং মানব সমাজের অধিনায়কত্বের গৌরবে কোন অংশ নাই আর ইহাও সর্বজনবিদিত যে, শির্ক অর্থাৎ জড়বাদ ও বহু-ঈশ্বরবাদ সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও নিকৃষ্ট অনাচার। ছুরত লোকমানে কথিত হইয়াছে যে, বস্তুতঃ শির্কই সর্বাপেক্ষা বড় অত্যাচার—১৩ আয়ত। ان الشرك لظلم عظيم -

অতএব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহারা অত্যাচারী এবং মুশরিক, তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে মানব সমাজের অধিনায়ক হইবার গৌরব লাভ করার কোনক্রমেই যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেনা। কাফির ও যালিমদিগকে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্যের আসনে সমাসীন দেখিয়া বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ, তাহাদের এই প্রাধান্য অবৈধ উপায়ে অর্জিত। দস্যু তস্করের ন্যায় তাহারা মানব সমাজের ধনপ্রাণের উপর—বলপূর্বক প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা আল্লাহর নিয়োজিত ও মনোনীত ইমাম বা নেতা নয়, তাহাদের অধিনায়কত্ব আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও খিলাফত নয়। হযরত ইবরাহীম অবুদীয়তের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দরুণেই জাতি-সমূহের নেতৃত্বের আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে 'খোদা-পরস্তীর' আদর্শ এবং অগ্রনায়ক রূপে মনোনীত করা হইয়াছিল, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যেই আল্লাহ নবুওতের বৃহত্তম নিয়ামতকে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোভাবের পর ভূপৃষ্ঠের যে কোন অংশে যে কোন নবীর অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, তাঁহারই জাতীয়তার অন্তর্গত ও তাঁহারই রীতির অনুসারীরূপে তিনি আগমন করিয়াছেন। রিছালতের পূর্ণ প্রতীক, নবীকুল সম্রাট, মানব মুকুট হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কেও আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন—হে রছুল, আপনি একনিষ্ঠরূপে ইবরাহীমের মিল্লতের অনুসরণ করুন—আন্‌নহল ১২৩ আয়ত। ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا -

এই কথা ছুরত আল্‌বাকারায় আরো পরিষ্কারভাবে কথিত হইয়াছে ইয়াহুদীয়ত ও নাছারানীয়ত প্রভৃতি ফির্কাবন্দীর সহিত আল্লাহর প্রকৃত হিদায়তের কোন সম্পর্কই নাই। ফির্কাবন্দীর অনুসরণ হইতে বিরত থাকার আদেশ দিয়া আল্লাহ তদীয় রছুলকে ঘোষণা করিতে বলিয়াছেন, আপনি বলুন, ফির্কাবন্দীর পরিবর্তে আমি একনিষ্ঠ ইমরাহীমের মিল্লতের অনুসারী—১৩৫ আয়ত। قل بل ملة ابراهيم حنيفا -

বুখারীতে প্রমাণিত রহিয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, ইবরাহীম সৃষ্টির উত্তম। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, হযরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) ব্যতীত হযরত ইবরাহীমই সমগ্র সৃষ্টির এবং সমুদয় নবীর শ্রেষ্ঠতম। আল্লাহর নিকট হইতে খলীলুল্লাহর গৌরবান্বিত পদবীদ্বারা তিনি বিভূষিত হইয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা সম্মানজনক পদবী আর নাই। ان ابراهيم خيرالبرية -

খলীলের তাৎপর্য

খলীল অপেক্ষা যে অধিকতর গৌরবান্বিত উপাধি আর নাই 'খলীল' ও 'খুল্লতের' আভিধানিক অর্থ হৃদয়ংগম করিলেই তাহা উপলব্ধি করা যাইতে পারিবে। অবুদীয়তের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা রূপে স্রষ্টার সহিত বান্দার চরম অনুরাগ এবং আল্লাহর রবুবীয়ত অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিপালকত্ব গুণের যাহা অনিবার্য প্রাপ্য আল্লাহর সহিত বান্দার সেই পরম প্রেম ও অনুরাগই 'খুল্লত' নামে অভিহিত হয় আর পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চরম আত্মত্যাগ, বিস্ময় এবং প্রণয়ের সমষ্টিগত ভাবকে অবুদীয়ত বলা হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, খুল্লতের আসন মহব্বতের আসন অপেক্ষা উন্নত। হযরত ইবরাহীম ইবাদতের দরুণেই এই উন্নত আসনে সমাসীন হইয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, শুধু হযরত ইবরাহীমই আল্লাহর খলীল ছিলেন আর আমাদের রছুল (দঃ)

আল্লাহর হাবীব ছিলেন কিন্তু এ ধারণা অজ্ঞতার পরিচায়ক। আমাদের রছুল হযরত মোহাম্মদ মুছতফা—(দঃ) যে রূপ আল্লাহর হাবীব ছিলেন, অনুরূপ ভাবে হযরত ইবরাহীমের মতই তিনি আল্লাহর খলীলও ছিলেন। বুখারী ও মুছলিম প্রভৃতি ছহীহ গ্রন্থ সমূহে বিভিন্ন রেওয়ায়তে প্রমাণিত রহিয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে খলীল গ্রহণ করিয়াছেন যেরূপ তিনি ইবরাহীমকে খলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আরো রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যদি পৃথিবীর কোন অধিবাসীকে আমি খলীল গ্রহণ করিতাম তাহাহইলে আবুবক্‌রকেই খলীল করিতাম কিন্তু তোমাদের এই সহচর (অর্থাৎ স্বয়ং রছুলুল্লাহ [দঃ]) আল্লাহর খলীল।

ان الله اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا —

لوكنت متخذا من اهل الارض خليلا لا تخذت ابابكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله !

আরো রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যদি আমি আমার রব্ব ব্যতীত অন্য কাহাকেও খলীল গ্রহণ করিতাম তাহাহইলে আবু বকরকেই খলীল করিতাম।

و لو كنت متخذا خليلا غير ربى لا تخذت ابابكر خليلا —

এই কথাগুলি হযরতের (দঃ) পবিত্র মুখে অন্তিম দশায় উচ্চারিত হইয়াছিল এবং নবুওতের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সংগে সংগেই তিনি এই মহান গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। উল্লিখিত হাদীছ সমূহের সাহায্যে এ কথাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ভূপৃষ্ঠের কোন অধিবাসীই রছুলুল্লাহর (দঃ) খলীল ছিলেননা। কারণ খুল্লতের তাৎপর্য এই যে, উহা সর্বদা অবিভাজ্য। মানুষ শুধু একজনেরই খলীল হইতে পারে। জনৈক কবি ইহারই অতি সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন :—

قد تخللت مسلك الروح منى
و بذا سمى الخليل خليلا !

আমার প্রিয়তমা আমার আত্মার পরতে পরতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে আর ইহার কারণেই (এই তখল্ললের জন্যই) খলীলকে খলীল বলা হইয়া থাকে।

হাবীব ও খলীলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, খুল্লতরূপী অনুরাগে অন্য কাহারো ভাগ বা অংশ থাকার উপায় নাই, কিন্তু হাবীবের মহব্বতের জন্য ইহা আবশ্যক নয়। একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির সহিত মহব্বত বা প্রণয় করা যাইতে পারে। আল্লাহর খলীল হইবার কারণে রছুলুল্লাহ (দঃ) অপর কাহাকেও খলীল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু আল্লাহর সহিত মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপিত থাকা সত্ত্বেও তিনি অপরাপর বহু ব্যক্তিকে হাবীব রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইমাম হাছান এবং হযরত উছামা বিনে যয়েদ সম্বন্ধে রছুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন— প্রভু হে, আমি এই দুই জনের সহিত মহব্বত রাখি, আপনিও উহাদিগকে ভালবাসুন এবং যাহারা ঐ দুই জনকে ভালবাসিয়া থাকে তাহাদিগকেও আপনি ভালবাসুন।

اللهم انى احبهما فاحبهما و احب من يحبهما —

অধীন অকিঞ্চন লেখকের প্রার্থনা, হে আল্লাহ, আপনাকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি অন্তরের অন্তস্থল হইতে রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রেয়স, ভগ্নি ফাতিমার দুলাল ইমাম হাছান এবং তাঁহার মিত্র উছামার সহিত অনুরাগ পোষণ করিয়া থাকি।

হযরত আম্‌র বিনুল আছ একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্যক্তি আপনার সর্বাপেক্ষা প্রেয়স? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আয়েশা! ইবনুল-আছ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরুষগণের মধ্যে কে? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহার পিতা! হযরত আলী সম্বন্ধে খয়বর সংগ্রামে রছুলুল্লাহ (দঃ) একদা বলিয়াছিলেন, আমি যুদ্ধের পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে সমর্পণ করিব, যিনি আল্লাহ ও তদীয় রছুলকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ ও রছুলও তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাকেন।

اى الناس احب اليك ؟ قال يارسول الله ؟ قال : عائشة ! فمن الرجل ؟ قال : ابوها !

لاعطين الراية رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله !

এরূপ দৃষ্টান্ত ছহীহ্ হাদীছ সমূহে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোরআনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ

করিলেও ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে মহব্বত বা প্রণয় বন্ধণে একাধিক ব্যক্তির সহিত আবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর। কোরআনের বহুস্থলে কথিত হইয়াছে, আল্লাহ মুত্তকী (সাধু) দিগকে ভালবাসেন, তিনি মুহ্ছিন (সদাচরণকারী) দিগকে ভালবাসেন, তিনি মুক্ছিৎ (ন্যায়পরায়ণ) দিগকে ভালবাসেন, তিনি তওবা (অনুশোচনা) কারীদিগকে ভালবাসেন, তিনি পরিশুদ্ধজনদিগকে ভালবাসেন, যাহারা তাঁহার পথে সারিবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করে তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন। বিশ্বাসপরায়ণগণ সম্বন্ধে ছুরত আল্ বাকারায় কথিত হইয়াছে যে, ঈমানদারগণ আল্লাহর সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ সম্পন্ন। এই আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, মহব্বত অবিভাজ্য বস্তু নয়। মুমিনগণ আল্লাহর সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত পোষণ করিলেও তাহারা অপরেরও অনুরক্ত হইতে পারে কিন্তু খলীলের অবস্থা এরূপ নয়। খলীলকে যে অনুরাগ ও প্রেম অর্পণ করা হইবে, তাহাতে আর কাহারো অধিকার বা অংশ নাই।

ঈমানের আস্বাদ ও মধুরতা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আল্লাহর মনোনীত ও প্রেয়স যে সকল বস্তু, তাহাদের অনুরক্ত হওয়াই আল্লাহর মহব্বতের তাৎপর্য। শরীঅতের আলোকেই আমরা এই তাৎপর্যে উপনীত হইয়াছি। এই প্রসংগে বুখারী ও মুছলিমের হাদীছটি পুনরায় পাঠ করিয়া দেখা উচিত। রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যাহার ভিতর তিনটি গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, সে ব্যক্তি ঈমানের আস্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তদীয়—রছুলকে (দঃ) অন্য সমুদয় বস্তু অপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কারণেই কাহারো অনুরাগ হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি কুফ্‌র হইতে উদ্ধার লাভ করার পর উহার দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবার কার্যকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবার মত মহা বিপদ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, এই তিনটি বস্তু যাহার মধ্যে রহিয়াছে সেই ব্যক্তি ঈমানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। একথার তাৎপর্য এই যে, কোন বস্তুর প্রতি অনুরক্ত হওয়ার পরেই তাহার মিলনের সুখ অনুভব করা সম্ভবপর। ধরুন—কোন ব্যক্তি একটি বস্তুকে অন্তরের সহিত ভালবাসে এবং উহাকে অন্তরের সহিত কামনা করিয়া থাকে, যখন সে ব্যক্তি উক্ত বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তাহার মন এক অপূর্ব আনন্দ ও মাধুর্য রসে আপ্লুত হইয়া উঠিবে। বস্তুর আস্বাদ বা লয্‌যত এরূপ অবস্থা বা আবেশের নাম, যাহা স্বীয় প্রকৃতির অনুকূল ও প্রেয়স। বাঞ্ছিত বস্তুর অনুভূতি ও প্রাপ্তির পরেই মানসলোকে উহার উদ্ভব ঘটিয়া থাকে।

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، و من كان يحب المرء لايحبه الا لله، و من كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار—

এক দল অর্বাচীন দার্শনিক ও চিকিৎসক মনে করিয়া থাকেন যে, কোন সুন্দর বস্তুর অনুভূতি ও প্রাপ্তিকেই লয্‌যত বা উহার মাধুর্যের আস্বাদ বলা হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। অনুভূতি ও প্রাপ্তি, আগ্রহ ও লয্‌যতের মধ্যবর্তী অবস্থার নাম, অনুভূতি ও প্রাপ্তি মাত্রই লয্‌যত নয়। দর্শনেন্দ্রিয় সুখ বোধ করিয়া থাকে মনোরম বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পর, দৃষ্টি মাত্রই সুখ বা লয্‌যত নয়। অতএব এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, দৃষ্টিপাত করা এবং সুখবোধ করা দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। বেহেশতের সুখ ও লয্‌যতের বর্ণনা প্রসংগে ছুরত আয্‌যুখরুফে কথিত হইয়াছে যে, বেহেশতের নিয়ামত গুলি এরূপ, যাহার জন্য অন্তর কামনা করিবে এবং চক্ষু লয্‌যত প্রাপ্ত হইবে—৭১ আয়ত।

و فيها ما تشتهيه الانفس و تلذ الاعين —

মানসলোকের সমুদয় অনুভূতির অবস্থাই এই রূপ। মনে সুখ দুঃখের যে সকল অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়া থাকে, সেগুলি কোন না কোন প্রিয় বা অপ্রিয় ব্যাপারের অনুভূতির পরিণতি মাত্র। অতএব ঈমানের আস্বাদ এবং উহার লয্‌যত ও আনন্দ আল্লাহর সহিত পূর্ণ অনুরাগের ফলেই সৃষ্টি হইতে পারে এবং তিনটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই এই স্থান অধিকার করিতে পারা যায়। প্রথম, উক্ত অনুরাগের পূর্ণতা সাধন, দ্বিতীয়, উক্ত অনুরাগের

অবশ্যম্ভাবী প্রভাব, তৃতীয়, উক্ত অনুরাগের প্রতিকূল যাহা, তাহার প্রতিরোধ এবং তাহার প্রতি বিরূপ চেতনার উন্মেষ। অনুরাগের পূর্ণতা সাধনের অর্থ হইতেছে মানুষের কাছে আল্লাহ এবং রছুল (দঃ) সমুদয় বিদ্যমান ও অবিদ্যমান জগত অপেক্ষা সর্বাধিক প্রিয় হইবেন, আল্লাহ এবং রছুলের (দঃ) মোটামুটি প্রেম যথেষ্ট হইবেনা, তাঁহাদের অনুরাগ ও প্রেম সর্বাধিক হওয়া চাই। অনুরাগের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবের অর্থ এই যে,—কাহারো প্রণয় বন্ধনে মানুষ আবদ্ধ হইলে সেই প্রণয় ও প্রীতি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হওয়ার পরিবর্তে উহাকে আল্লাহর অনুরাগ-সাপেক্ষ করিতে হইবে আর প্রতিকূলের প্রতিরোধ করার অর্থ হইতেছে, ঈমানের বিপরীত কুফর এবং শির্ক প্রভৃতিকে মানুষ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষাও ভয়াবহ মনে করিবে।

ইলাহী প্রেমের তাৎপর্যে বাড়াবাড়ি

ফলকথা, আল্লাহর প্রেম অর্থাৎ মহব্বত এবং একনিষ্ঠ প্রেম অর্থাৎ খুল্লতের মধ্যেই আল্লাহর অবুদীয়তের তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বিদ্বানগণের একটি দল ধারণা করিয়া থাকেন যে, নীরস প্রণতি এবং চরম বিনয় প্রকাশের কার্যকেই অবুদীয়ত বলা হয়, ইহার মধ্যে প্রেম ও অনুরাগের স্থান নাই। তাঁহারা মনে করেন, হৃদয়ের উদ্দাম বাসনা এবং তজ্জনিত আনন্দের আবেশই অনুরাগ ও মহব্বতের নামান্তর, পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের মানাভিমান ইত্যাদি চপলতা প্রেমরসের অপরিহার্য উপাদান। আল্লাহর রবুবীয়ত এবং প্রতিপালকত্ব গুণের ভিতর এ সকল বিষয়ের অবকাশ নাই। আল্লাহকে প্রেমিক বা প্রেমাস্পদ রূপে কেমন করিয়া ধারণা করা সম্ভবপর?

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মহব্বতের সঠিক তাৎপর্য অবগত হইতে না পারার দরুণেই এই ভ্রান্তির উদ্ভব ঘটিয়াছে। একদা হযরত যুন্নুন মিছরীর সম্মুখে আল্লাহর মহব্বতের আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, "চুপ করিয়া থাক! এ বিষয়ে কথাবার্তা বলিওনা, এরূপ যেন না হয় যে, তোমাদের কথা শুনিয়া আনাড়ীর দল আল্লাহর মহব্বতের দাবী করিতে লাগিয়া যায়"। যাহারা ভয়, ধ্যান ও যিক্‌র ছাড়াই আল্লাহর মহব্বতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, কতিপয় বিদ্বান তাহাদের সাহচর্য করিতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে জনৈক বিদ্বান যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার উপযুক্ত। তিনি বলিয়াছেন, যে-

من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق و من عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد -

ব্যক্তি শুধু অনুরাগ ভরে আল্লাহর ইবাদত করিবে, সে ধর্ম-ভ্রষ্ট এবং যে শুধু আশাধারী হইয়া ইবাদত করিবে সে মুর্জিয়া এবং যে ব্যক্তি শুধু ভীত ও সন্ত্রস্ত মনে ইবাদত করিবে সে খারেজী কিন্তু যে ব্যক্তি অনুরাগ, ভয় ও আশার মিশ্রিত ভাব লইয়া আল্লাহর ইবাদত করিবে সে ব্যক্তি মুমিন ও তওহীদ-পরস্ত।

পরবর্তী যুগের ছুফীদলের মধ্যে এরূপ ধরণের অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা মহব্বতের দাবীতে সীমালংঘন করিয়া চলিয়াছে। এমন কি তাহাদের মধ্যে একরূপ অহংকারের ভাবও সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা এরূপ ধরণের দাবীও করিয়া বসিয়াছে যাহা এইয়াকা না'বুদু অর্থাৎ আবাদীয়তের আসনের পরিপন্থী। তাহাদের হাবভাবে রবুবীয়তের অভিমান প্রকট, তাহারা নিজেদিগকে এরূপ স্থানের অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে, যাহা নবুওত ও রিছালতের আসন অপেক্ষাও সমুন্নত। তাহারা নিজেদের জন্য এরূপ গুণ ও শক্তির অভিমান পোষণ করিয়া থাকে, যেগুলি নবী ও রছুলগণেরও উপযোগী নয়। এই ভয়াবহ বিভ্রান্তির ফলেই তরীকত পন্থী অনেক বড় বড় পীর ও শয়েখ শয়তানের ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। অবুদীয়তের তাৎপর্য আর ইবাদতের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ংগম করিতে না পারার কারণেই তাঁহাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। যে ইমানী প্রজ্ঞার সহায়তা ব্যতিরেকে

মানুষের পক্ষে নিজের বাস্তব স্বরূপ অবগত হওয়া সম্ভবপর হয়না. উপরিউক্ত তথাকথিত ছুফীগণের মধ্যে সেই প্রজ্ঞার একান্তই অভাব ঘটিয়াছে। জ্ঞানের অপরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অভাব নিবন্ধন প্রবৃত্তি যখন প্রেমরসে হাবুডুবু খাইতে থাকে তখন আত্মা তাহার বাস্তব সম্বিত হারাইয়া ফেলে, তাহার সীমা রেখা সে রক্ষা করিয়া চলিতে পারেনা। এই ভাবে প্রবৃত্তি শয়তানের প্রবঞ্চনায় সম্মোহিত হইয়া পড়িলে তাহার মুখ দিয়া বড় বড় বোল নিঃসৃত হইতে থাকে। সে প্রকাশ্যই বলিয়া বেড়ায়—"আমি আল্লাহর প্রেমিক, আমি যদৃচ্ছ ভাবে চলাফেরা করিব, আমি বন্ধন মুক্ত! শরীঅতের এবং নীতি নৈতিকতার কোন আইনই আমার প্রতি প্রযোজ্য নয়।" কিন্তু ইহা যে খোলাখুলি শয়তানী এবং গোমরাহীর উক্তি তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। পূর্ববর্তী ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ছুফীর দলকে এই অভিমানই প্রমত্ত করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা আল্লাহর পুত্র نحن ابناؤ الله واحباؤه ও প্রেয়স! ইহা প্রবৃত্তির মারাত্মক প্রবঞ্চনা! আল্লাহর প্রকৃত প্রেয়স যে, তাহার প্রভু তাঁহার মনোনীত কার্যেই তাহাকে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। যেকার্যে তিনি অসন্তুষ্ট, আল্লাহর প্রেমাস্পদ যাহারা, তাহারা কদাচ সে কার্যে নিমগ্ন থাকিতে পারেনা। আল্লাহ স্বীয় বান্দার উত্তম আচরণগুলিকে যেরূপ সন্তোষ ও প্রীতির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, যাহারা মহাপাতকে লিপ্ত থাকে এবং আইনের পর আইন ভংগ করিয়া চলে, তাহাদের অসৎকর্মগুলিকে সেইভাবেই আল্লাহ ক্রোধ এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন। বান্দার ঈমান এবং সাধুতার পরিমাণ অনুসারেই আল্লাহ তাহাকে প্রেমদান করেন।

যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে যে, আল্লাহর 'প্রিয়জন' হইবার কারণে পাপ এবং অপরাধের কোন কালিমাই তাহাকে মসীময় করিতে পারিবেনা, তাহার অবস্থা এরূপ একজন নির্বোধ স্বাস্থ্যবানের ন্যায়, যে ব্যক্তি স্বীয় স্বাস্থ্যের দৃঢ়তা এবং শারীরিক সুস্থতার অহমিকতায় এই ধারণার বশবর্তী হইয়াছে যে, যতই সে বিষপান করুক না কেন, তাহাতে তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবেনা। উপরিউক্ত শ্রেণীর বিভ্রান্ত ছুফীর দল যদি কোরআনের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিত এবং নবীগণের জীবন-কাহিনী অভিনিবেশ সহকারে পাঠকরার সুযোগ পাইত, তাহাহইলে তাহারা বুঝিতে পারিত যে, মানবসমাজের বরেণ্য এই নেতৃবৃন্দের জন্যও কিরূপ ভাবে মাঝে মাঝে তওবা, অনুশোচনা, ইছ্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। আল্লাহর এই সকল প্রিয়তমদিগকেও আত্মশুদ্ধির জন্য কেমন করিয়া বিপদাপদের অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। পাপের বিষময় ফল এরূপ নির্ঘাত এবং নিষ্ঠুর যে, যে যত বড় মানুষই হোক না কেন, উহার বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াকে সে এড়াইয়া যাইতে পারেনা। দার্শনিকতার কথা ছাড়িয়া দিয়া বাস্তব জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এই নীতির সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধ হইবে। কোন প্রেমিক যদি তাহার প্রেমাস্পদের রুচি ও অভিরুচির প্রতি দৃকপাত না করিয়া শুধু স্বীয় প্রবৃত্তির অনুপ্রেরণায় অবিরত নর্তন-কুর্দন করিতে থাকে, তাহাহইলে সে স্বীয় প্রেমাস্পদের মনোরঞ্জনের পরিবর্তে তাহার বিরক্তি ও ক্রোধের পাত্রই যে হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ ছুলুক পন্থীগণের মধ্যে এরূপ লোকের অভাব নাই, যাহারা আল্লাহর মহব্বতের দাবীদার সাজিয়া নানাবিধ ধর্ম বিরুদ্ধ উক্তি উচ্চারণ করিয়াছে এবং ধর্ম বিগর্হিত কার্যকলাপে রত হইয়াছে। কখন বা তাহারা ইলাহী-বিধানের অনুবর্তিতা পরিহার করিয়া চলিয়াছে আর কখন বা 'হকুকুল্লাহ'-কে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, কখন বা মিথ্যা ও অলীক উক্তি তাহাদের রসনা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ইহাদেরই কেহ এরূপ কথা বলিয়া বসিয়াছে যে, আমার কোন মুরীদ যদি একজনকেও দুযখে রাখিয়া যায়, তাহাহইলে আমি সেই মুরীদের প্রতি অসন্তুষ্ট। কেহ

اى مريد لى ترك فى النار احدا فانا منه برئ —

আস্ফালন করিয়া বলিয়াছে, একজন মুছলমানকেও যদি আমার কোন মুরীদ দুযখে যাইতে দেয়, তাহাহইলে উক্ত মুরীদের সহিত আমার কোন সম্পর্কই নাই। প্রথমোক্ত ছুফী ছাহেবের দম্ভ এইযে, তিনি মুছলিম ও কাফির কাহাকেও দুযখে থাকিতে দিবেননা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কোন কবীরা গোনাহর পাপীকেও দুযখের ছায়া মাড়াইতে দিবেননা আর একজনের ধৃষ্টতা এতদূর চরমে উঠিয়াছে যে তিনি বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিবসে আমি দুযখের দুয়ারে আমার শিবির সন্নিবেশিত করিব এবং একজন ব্যক্তিকেও উহাতে প্রবেশ করিতে দিবনা। এই সকল এবং ইহার অনুরূপ বহু ধৃষ্ট উক্তি এমন এমন খ্যাতনামা তাপস ও সাধু সজ্জনগণের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, এগুলিকে তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিছুতেই প্রবৃত্ত হয়না। সুতরাং হয়ত এগুলি সর্বৈব মিথ্যা আর বথার বথা, সত্যই যদি এই উক্তি গুলি তাঁহাদের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাহইলে এই কথাগুলি সম্পূর্ণ অসত্য এবং ভ্রান্তি মূলক। তাঁহারা সুস্থজ্ঞানে কখনই এরূপ কথা বলেন নাই। ছুলুকের উন্মত্ততা (ছুকর) অথবা পরাজয় (গালাবা) কিংবা ফানা অর্থাৎ নির্বাণত্বের প্রভাবেই এই ধরণের কথা তাঁহাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, কারণ উল্লিখিত ত্রিবিধ অবস্থায় মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে এবং সে অনুভব করিতে পারেনা যে, তাহার মুখ দিয়া কোন্ কথা নির্গত হইতেছে? এই সকল ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতই খোদা-পরস্ত, তাঁহারা তাঁহাদের 'উন্মত্ত দশা' তিরোহিত হইবার সংগে সংগেই তাঁহাদের মুখনিঃসৃত স্পর্ধিত উক্তির জন্য তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনাকরিয়া গিয়াছেন।

اى مريد اى ترك احدا
من المؤمنين يدخل
النار فانا برى
منه —

নেতৃস্থানীয় ছুফীদলের মধ্যে যাঁহারা অনুরাগ, অগ্রহ, অপযশ ও আত্মসমর্পণ প্রভৃতি ভাবাবেশ সম্পর্কিত সংগীত শ্রবণ করার রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যও প্রকৃতপক্ষে ইহাই ছিল।

অনুরাগের মান

প্রণয় ও অনুরাগের পথে যেসকল বিভীষিকা ও সংকটের কথা এযাবত আলোচিত হইল, সেই গুলি হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ বাস্তব প্রেমের একটি মান নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। এই মানদণ্ডের সাহায্যেই আল্লাহর অনুরাগ ও প্রেমের সকল দাবীদারকে যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, সত্যই যদি তোমরা আল্লাহর সহিত অনুরাগ পোষণ কর, তাহাহইলে তোমরা আমার জীবনাদর্শের অনুসরণ করিয়া চল, তবেই তোমরা আল্লাহর প্রীতিভাজন হইতে পারিবে—আলে-ইমরান, ৩১ আয়ত।

قل ان كنتم تحبون الله
فاتبعونى يحببكم الله !

অর্থাৎ আল্লাহর রছুল হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) পবিত্র পদাংক অনুসরণ করিয়া চলার কার্যকে যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনের চরম ও পরম লক্ষ রূপে গ্রহণ করিবে তাহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর অনুরাগের যথার্থ দাবীদার বলা যাইতে পারিবে। রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণই অবুদীয়তের সক্রিয়—তাৎপর্য। পুনশ্চ কোরআনে আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) প্রকৃত অনুরাগের আর একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ নির্ধারিত হইয়াছে, ইহা হইতেছে আল্লাহর পথে জিহাদ! জিহাদের অর্থ হইতেছে, আল্লাহর আদেশ সমূহের আসক্তি এবং তাঁহার নিষেধ সমূহের প্রতি পূর্ণ বিরক্তি। আর এই জন্যই যাঁহারা আল্লাহর প্রিয় এব যাঁহারা আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত তাঁহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, যাহাদিগকে আল্লাহ প্রেম করেন এবং যাহারা তাঁহাকে প্রেম দান করিয়া থাকে, তাহারা বিশ্বাসপরায়ণগণের প্রতি বিনম্র এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর, তাহারা সংগ্রাম করিয়া

يحبهم ويحبونه اذلة على
المؤمنين اعزة على
الكافرين يجاهدون فى
سبيل الله لا يخافون
لومة لائم —

থাকে আল্লাহর পথে এবং তাহারা কোন ভর্ৎসনা-কারীর ভর্ৎসনার প্রতি দৃকপাত করেনা—আল মায়েদা ৫৪ আয়ত।

পূর্ববর্তী জাতিবর্গের তুলনায় এই উম্মতের মহব্বত অর্থাৎ অনুরাগ ভাব অধিকতর পূর্ণ ও সর্বাংগ সুন্দর। ইহাদের অবুদীয়ত পূর্ববর্তী জাতিবর্গের তুলনায় সুস্পষ্ট ও অধিকতর পরিপুষ্ট। আবার এই উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 'কামিল' হইতেছেন—রছুলুল্লাহর (দঃ) সহ-চরবৃন্দ অথবা যাঁহারা তাঁহাদের পরিগৃহীত আদর্শের অনুসরণকারী। এক্ষণে শুধু মহব্বতের ধৃষ্ট দাবীদার দলের অবস্থা আল্লাহর প্রশংসিত প্রেমিক দলের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখা উচিত।

ফলকথা—শরীঅতের বিধানের অনুসরণ এবং আল্লাহর পথে সংগ্রামই আল্লাহর সত্যকার প্রেমিক এবং ভ্রান্ত দাবীদার দলের মধ্যবর্তী সীমারেখা। মিথ্যুক প্রেমিকের দল প্রেমের গগনভেদী দাবীর সংগে সংগে শরীঅত-বিরুদ্ধ মানস-কল্পিত বিদ্‌আত-সমূহের অনুসরণ করিয়া থাকে এবং তাহারা প্রেমের এই মনগড়া তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছে যে, আল্লাহর সৃষ্ট সমুদয় বস্তু, এমন কি কুফ্‌র, অনাচার ও মহাপাপ-কেও ভালবাসিতে হইবে। ঐশ প্রেমের শিক্ষা-কোর-আনের মতই তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি গ্রন্থেও মওজুদ রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থের শব্দ, ভাষা এবং প্রদত্ত শিক্ষা সম্পর্কে উহাদের ধারক দলের মধ্যে যতই মতানৈক্য পরিলক্ষিত হউক না কেন, ঐশ-প্রেমের শিক্ষার মৌলিকতা সম্বন্ধে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণের মধ্যে কোনই মতভেদ নাই। ইহাকেই 'পবিত্রাত্মা'র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বুনিয়াদী উপদেশ রূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে। হযরত ঈছা মছীহও ওছীয়ৎ করিয়া গিয়াছেন যে, তুমি পরম পিতার সহিত প্রেম কর, তোমার পূর্ণ হৃদয় এবং পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ আত্মা দিয়া তাঁহার সহিত প্রেম কর। খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ভিতর বৈরাগ্য ও উপাসনার যে ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে যীশু খৃষ্টের এই উপ-দেশেরই ফল বলা যাইতে পারে। কিন্তু আসল ব্যাপার খানা কি? আল্লাহর অনুরাগের দাবী যত বড় যোর গলায় তাঁহারা করুন না কেন, প্রকৃত ঐশ প্রেম হইতে খৃষ্টানরা বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে আর ইহার কারণ এই যে, যেসকল বিষয় আল্লাহর অভিপ্রেত তাহারা সেগুলির অনুসরণ না করিয়া যে সকল বিষয় আল্লাহর ঘৃণিত ও অমনোনীত, ঐশ-প্রেমের অহংকারে মত্ত হইয়া তাহারা সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা প্রকৃতই আল্লাহর প্রেমিক আল্লাহও তাঁহা-দিগকে করুণা পুরঃস্বর স্বীয় প্রেম হইতে কদাচ বঞ্চিত করেননা। এ কথা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, বান্দার হৃদয় আল্লাহর প্রেমালোকে উজ্জ্বল হইবে অথচ আল্লাহ তাহার প্রতি দৃকপাত করিবেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে বান্দা আল্লাহকে যে পরিমাণ প্রেম করে ঠিক সেই পরিমাণ অনুসারেই আল্লাহ স্বীয় প্রেম দ্বারা বান্দা-কেও গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন এবং তাঁহার—অধিকতর অনুকম্পা ও দয়া বান্দার প্রতি এই রূপ হয় যে, তিনি তাহার প্রেমের তুলনায় তাঁহাকে বহু গুণ অধিক পুরস্কৃত করেন। হাদীছ-কুদ্‌ছীতে কথিত হইয়াছে, আল্লাহ বলেন, যে আমার দিকে এক—

قال الله تعالى : من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا، و من تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا - و من اتانى يمشى اتيته هرولة -

বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে এক হস্ত পরিমাণ আগাইয়া যাই আর যে আমার—দিকে এক হস্ত আগাইয়া আসে আমি তাহার দিকে একগজ পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে পায়ে হাঁটিয়া আগমন করে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া অগ্রসর হই। আরো আল্লাহ সংবাদ দান করিয়াছেন যে, তিনি

ان الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب التوابين و يحب المتطهرين -

মুত্তকী ও মুহছিন-দিগকে ভালবাসেন, তিনি ধৈর্যশীলদিগকে ভালবাসেন, তিনি তওবাকারীদিগকে ভালবাসেন এবং যাহারা পরিচ্ছন্ন তাহাদিগকে—

(২০৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জাতীয়তার স্বরূপ ও আদর্শ

"মুছলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি," এই মতবাদকে ভিত্তি করিয়াই পাকিস্তানের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। এই মতবাদে যে প্রচণ্ড শক্তি ও বাস্তবতা নিহিত ছিল, তাহার কল্যাণেই পাক-ভারত উপমহাদেশের মুছলমানগণ যুগপৎ ভাবে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটিশ ও হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া পাকিস্তানের সংগ্রাম জিতিয়া লইয়াছিলেন। বর্তমানের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক দল লোক, যাঁহাদের অতীতে পাকিস্তান আদর্শের সহিত কোন সহানুভূতি ছিল না বরং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে যাঁহারা পাকিস্তান সংগ্রামের বিরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলভুক্ত কতিপয় হিন্দু ও মুছলমান কিছুকাল হইতে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মুছলিম জাতির স্বাতন্ত্রের বাণী পাক সংগ্রামের ধ্বনি রূপে গৃহীত হইলেও পাকিস্তান অর্জিত হইবার পর উল্লিখিত ধ্বনির আর আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা এরূপ কথা বলিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের অন্য যেকোন উদ্দেশ্যই থাকুকনা কেন, পাকিস্তানের সংগ্রাম যে কোন মহান আদর্শের জন্য শুরু করা হয় নাই পক্ষান্তরে ইহার সেনানীবৃন্দ লক্ষহীন আদর্শের উপর হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া শুধু খামখেয়ালীর বশবর্তী হইয়া এই রক্তক্ষয়ী ও ধনক্ষয়ী প্রচণ্ড লড়াই পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই উপমহাদেশের সমুদয় মুছলমানকে নির্বোধ বানাইয়াছিলেন, মুছলিম জাতির স্বাতন্ত্র বিরোধী হিন্দু ও মুছলিম রাজনৈতিক নেতার দল জনসাধারণকে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্তানের জনক এবং পাক সেনানীবৃন্দ ও পাকিস্তানের মুছলমানগণের বিরুদ্ধে আরোপিত উল্লিখিত অভিযোগটি যতই অসত্য ও অবমাননাকর হউক না কেন, আমরা বক্ষমান নিবন্ধে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবনা। মুছলমানগণ সত্যই একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি কিনা এবং জাতীয়তার স্বরূপ ও প্রকৃত তাৎপর্য কি, আমরা এস্থলে শুধু তাহাই বিচার করিয়া দেখিব।

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের পথে ইছলামের ধর্মীয় জাতীয়তার আদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এক দুর্লংঘ পর্বত পরিমাণ বাধারূপে বিদ্যমান ছিল। ইউরোপের কূটনীতি বিশারদগণের সংগে সংগে তাঁহাদের সাহিত্যিক এবং কবির দলও বহুকাল হইতে মুছলিম রাজ্যসমূহে ইউরোপীয় জাতীয়তা অর্থাৎ স্বাদেশিকতার—[Nationalism] আদর্শ প্রচার করার জন্য তাঁহাদের শক্তি নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধেই তাঁহাদের এই ষড়যন্ত্র বহুল পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। ইহারই ফলে খিলাফতে-ইছলামীয়ার বিলুপ্তি ঘটাইয়া তুরস্কে এবং মধ্য এশিয়ায় স্বাদেশিকতার ভিত্তিতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দলের আশ্রয়ে মুছলিম রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ভৌগলিক বিভাগের দিক দিয়া মানুষের পক্ষে হিন্দী, আরব, ঈরানী, তুরানী ও জাপানী রূপে পরিচিত হওয়া দোষাবহ নয়। কারণ মানুষ বসুন্ধরার যেকোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অংশে জন্ম গ্রহণ অথবা বসবাস করিবে, সেই অংশের সহিত তাহার নাড়ীর যোগাযোগের কথা বিস্মৃত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ইছলাম মানবত্বের অখণ্ডতার যে যুগান্তকারী আদর্শ পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছে, মানুষের নাড়ীর পরিচয় যখন তাহার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় তখন 'লাত ও মানাত' এবং 'শিব ও দুর্গার' মতই এই ভৌগলিক জাতীয়তা ইছলামের দৃষ্টিতে প্রতিমা পূজার—আকার পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

ইছলাম মানব জাতির শুধু নীতি নৈতিকতার আদর্শকে সংশোধিত ও সুগঠিত করিতে আসে নাই, মানুষের সামাজিক জীবনেও ইছলাম একটি বিপুল ও মৌলিক বিপ্লব ক্রামশিক ভাবে বিস্তৃত করিতে আসিয়াছিল। মনুষ্য সমাজের পুরাতন মান্ধাতা যুগীয় জাতীয় ও গোত্রীয় দৃষ্টিভংগীর আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া ইছলাম মানুষের মধ্যে তাহার বিবেক এবং জ্ঞানের চেতনা উন্মেষিত—করিতে চাহিয়াছিল। প্রাচীন কালে মিছরীয়, গ্রীক ও ভারতীয়দের মধ্যে ধর্ম তাহাদের জাতীয় সম্পদ রূপে গৃহীত হইত। পরবর্তী কালে ইয়াহুদীগণ ইহাকে গোত্রীয় সম্পদে

পরিণত করেন। খৃস্টানদের প্রবর্তিত শিক্ষা অনুসারে ধর্ম [Religion] ব্যক্তিগত [Private] বস্তুতে পর্যবসিত হয়। এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া উত্তর কালে ইউরোপে—সামাজিক জীবনের সমুদয় দায়িত্ব রাষ্ট্রের [State] স্কন্ধেই অর্পণ করা হয়। পৃথিবীর সৃষ্টির পর মানব জাতির অধিনায়ক হযরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, ধর্ম যেরূপ জাতীয় বা গোত্রীয় সম্পদ নয়, সেইরূপ উহা প্রাইভেট বস্তুও নয়। তিনি ঘোষণা করেন যে, ধর্ম অবিমিশ্র সামগ্রিক মানবত্বের নাম। একাধারে প্রাকৃতিক এবং রুচিগত বৈষম্যগুলি মানিয়া লইয়া নিখিল মানব সমাজকে একীভূত ও সংগঠিত করাই ইছলামের চরম উদ্দেশ্য। ভৌগলিক জাতীয়তা (Geographical Nationality) এবং গোত্রজ জাতীয়তার (Racial Nationality) বুনিয়াদে ইছলামী আদর্শের কার্যক্রম রচনা করা যেরূপ সম্ভবপর নয়, উহাকে ব্যক্তিগত সামগ্রী রূপে অভিহিত করাও তেমনি নিরর্থক ও অসম্ভব। সুতরাং ইছলামে জাতীয়তার সৌধকে শুধু মতবাদের (Ideology) ভিত্তিতেই গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

বিশ্বমানবের চিন্তাধারা এবং তাহাদের অনুভূতির মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য ঘটাইবার পক্ষে জাতীয়তার ভিত্তি একমাত্র 'আদর্শবাদে'র (Idelogy) উপর প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র অব্যর্থ ব্যবস্থা। ভাষার মিল অপেক্ষা মনের মিলই যে উত্তম এবং দৃঢ়তর ইহা সর্ববাদী সম্মত। আদর্শবাদের পরিবর্তে অন্য যেকোন পথ অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহা নাস্তিকতার পথ হইবে এবং তাহা অখণ্ড মানবত্বের গৌরবের অন্তরায় হইবে।

ইউরোপে ধর্মীয় ঐক্য ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার পর যখন তাহারা বিভিন্ন ভৌগলিক জাতীয়তায় বিভক্ত হইয়া পড়িল তখন তাহাদের মধ্যে এই চিন্তার উদ্ভব ঘটিল যে, অতঃপর জাতীয় জীবনের বুনিয়াদ স্বরূপ কোন্ বস্তু অবলম্বিত হইবে? তাহারা ইহার বুনিয়াদ স্বাদেশিকতার পরিকল্পনায় খুঁজিয়া পাইয়াছিল। এই নির্বাচনের কি পরিণতি ঘটিল? মার্টিন লুথারের সংস্কার, অর্বাচীন যৌক্তিকতার অভ্যুদয় এবং ধর্মীয় নীতিনৈতিকতার সহিত রাষ্ট্রীয় আদর্শের সংঘর্ষ ও সংগ্রাম। এই অনিষ্টকরী শক্তিগুলি ইউরোপকে কোন্ পথে ধাক্কা মারিয়া লইয়া গিয়াছে? নাস্তিকতা, জড়বাদ এবং অর্থনৈতিক সংগ্রাম ব্যতীত ইউরোপের পক্ষে অন্য কিছু লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে কি? যাঁহারা ধর্মের পরিবর্তে স্বাদেশিকতাকে জাতীয়তার বুনিয়াদরূপে গ্রহণ করিতে চান, তাঁহারা পাকিস্তান তথা এশিয়ায় ইউরোপের এই ভয়াবহ পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঘটাইতে ইচ্ছা করেন কি?

একদল লোক বলিয়া থাকেন, বর্তমান যুগের মানবসমাজ জাতীয়তার জন্য স্বাদেশিকতার বুনিয়াদ অপরিহার্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু

(২০৬ পৃষ্ঠার পর)

ভালবাসেন। মোটের উপর যেসকল কার্য ওয়াজিব অথবা মুছতহব সেগুলির প্রত্যেকটির সমাধাকারীকে তিনি ভালবাসিয়া থাকেন! বিশুদ্ধ হাদীছে-কুদ্‌ছীতে কথিত হইয়াছে যে, আল্লাহ বলিয়াছেন, বান্দা নফলী ইবাদতের সাহায্যে আমার নৈকট্য লাভ করিয়া থাকে, এমন কি সে আমার প্রেয়সে পরিণত হয়। আমি যখন তাহাকে প্রেম দান করি তখন আমি তাহার কর্ণে পরিণত হই, সেই কর্ণ দ্বারা সে শ্রবণ করিয়া থাকে। আমি তাহার চক্ষুতে পরিণত হই, সেই চক্ষু দ্বারা সে দর্শন করে।

لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به .....الحديث

উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা আল্লাহর প্রিয়, তাঁহারা আল্লাহর কোন অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ এবং আল্লাহর অপ্রিয় কোন বস্তু দর্শন করেন না। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গুলি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর পবিত্র অভিপ্রায় এবং নির্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হইয়া—থাকে। (ক্রমশঃ)

ইহা সুস্পষ্ট যে, এরূপ ধরণের জাতীয়তার জন্য শুধু স্বাদেশিকতার ভাবধারাই যথেষ্ট নয়। জাতীয় জীবনের ঐক্য এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য ইহার সংগে সংগে আরো কতকগুলি প্রেরণার বিদ্যমানতা অপরিহার্য হইবে, যথা—ধর্মীয় জীবনের প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞার ভাব এবং দৈনন্দিন জীবনে রাজনৈতিক কলাকৌশলের প্রাদুর্ভাব। কূটনীতি বিশারদগণ রাজনৈতিক জীবনের সমন্বয় সাধন কল্পে দৈহিক ও মানসিক বিলাসিতার যে সকল নুছ্খা প্রবর্তন করিতে থাকিবেন, চক্ষু-কর্ণ বন্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে সেগুলির রূপায়ণ সামাজিক জীবনের সংহতির পক্ষে অনিবার্য হইয়া উঠিবে। জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ ভাগে ধর্মীয় প্রভাব যতই গভীর ভাবে রেখাপাত করিয়া থাকুকনা কেন, ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়া শুধু নাস্তিকতার কেন্দ্রেই সমগ্র জাতি পরিণামে সংহত হইতে বাধ্য হইবে। একজন সাধারণ মানুষ যিনি ধর্মীয় প্রভাবের গুরুত্বকে মানুষের জীবনে অস্বীকার করিতে পারেননাই, তাঁহার পক্ষে এই 'লাদ্বীনী আদর্শকে' এক মুহূর্তের জন্যও বরদাশ্ত করা সম্ভবপর নয়। যেসকল মুছলমান এখনও এই ধোকায় পড়িয়া আছেন যে, রাজনৈতিক আদর্শবাদের দিক দিয়া তাঁহাদের ধর্ম এবং স্বাদেশিকতা একত্রিত ভাবে অবস্থান করিতে পারে, তাঁহারা নির্বোধদের স্বর্গরাজ্যে বাস করিয়া থাকেন। এই পথের শেষ মন্‌যিল 'লাদ্বীনী' ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেনা। ঊর্ধপক্ষে এরূপ অবস্থায় ইছলামকে নীতি-নৈতিকতার (Morality) উপদেশমালারূপে মান্য করা যাইতে পারিলেও উহার সামাজিক ব্যবস্থার কোন মূল্যই অবশিষ্ট রহিবেনা।

দীর্ঘকাল হইতে ইউরোপ এবং তাহার পোষ্যপুত্রগণ এই উপমহাদেশের মুছলমানদিগকে বুঝাইয়া আসিতেছেন যে, ধর্ম এবং রাজনীতি দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু। তোমরা ধর্মকে শুধু প্রাইভেট অর্থাৎ ব্যক্তিগত বস্তুরূপে গ্রহণ কর এবং ব্যক্তিগত জীবনেই উহাকে সীমাবদ্ধ রাখ। রাজনীতির দিক দিয়া তোমরা কদাচ মুছলিমদিগকে স্বতন্ত্র জাতিরূপে কল্পনা করিওনা। হিন্দু ভারতের এই দুষ্ট প্রচারণার ভয়াবহ পরিণতি হইতে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে। হিন্দু-ভারতে 'ইছ্‌লামী-জাতীয়তা'র পরিকল্পনা সাফল্য মণ্ডিত হইবেনা আশংকা করিয়াই পকিস্তানের দাবী উত্থিত হইয়াছিল এবং ইছলামী জাতীয়তার রূপায়ণ কল্পেই পৃথিবীর মানচিত্রে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। কিন্তু অশেষ দুঃখ ও অপরিসীম লজ্জার কথা এইযে, পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর ইছলামী-সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি জনগণের প্রাণের স্পন্দনের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে পুনরায় যুক্ত জাতীয়তার ধুয়া ধরার জন্য ইছলাম বিরোধীদলের সারিতে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছে।

শিক্ষিত মুছলিম জনগণের জন্য তিনটি প্রশ্ন বিশেষ ভাবে অনুধাবন যোগ্য। প্রথম, মুছলমানগণ সমষ্টিগত ভাবে অখণ্ড, পরস্পর সংযুক্ত এবং সর্বজনবিদিত এরূপ একটি জামাআত (সংঘ) কিনা যাহার বুনিয়াদ তওহীদ এবং নবুওতের পরিসমাপ্তির আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত? না উহা এরূপ একটি জামাআতের নাম যাহা গোত্র, বর্ণ ও ভাষার বৈশিষ্ট অনুসারে তাহাদের দলীয় সংহতি [Solidarity] পরিহার করিয়া অন্য যে কোন আইন ও জীবন-ব্যবস্থার অধীনে পৃথক সমাজও গঠন করিবার অধিকারী? দ্বিতীয়, যে ভিত্তির উপর মুছলমানগণের জাতীয়তা গঠিত হইয়াছে তদনুসারে এরূপ সমাজ বা দল কোরআনের কোন স্থানে কওম বা নেশন (Nation) রূপে অভিহিত হইয়াছে কি? না এরূপ দল বা জামাআত কোরআনী পরিভাষায় শুধু উম্মত অথবা মিল্লত রূপেই অভিহিত হইয়াছে? তৃতীয়, কোরআনে অথবা রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্বোধনে কুত্রাপিও এরূপ কথা বলা হইয়াছে কি যে, হে মুমিনগণ, তোমরা মুছলিম জাতির বা কওমের অন্তর্ভুক্ত হও? অথবা উক্ত জাতীয়তার অনুসরণ কর, না কোরআনে শুধু এই কথাই বলা হইয়াছে যে, তোমরা মিল্লতের অনুসরণ কর? উম্মতের অন্তর্ভুক্তিকেই মুছলিম জাতির গৌরব রূপে কোরআনে উল্লেখ—করা হইয়াছে কিনা?

কোরআনের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল স্থানে মুছলমানদিগকে কোন দলে যোগদান করিতে বলা হইয়াছে, সেই সকল

স্থলে নির্দিষ্ট কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবার আহ্বানের পরিবর্তে মিল্লত অথবা উম্মতে যোগদান করার জন্যই আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ছুরত আন্‌নিছায় বলা হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবন-পদ্ধতির অনুসারী কে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে এবং সদাচারশীল হইয়াছে এবং এক পথের পথিক ইবরাহীমের মিল্লতের অনুসারী হইয়াছে? ১২৫ আয়ত।

ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا -

হযরত ইউছুফ তাঁহার প্রসিদ্ধ কারাগারের বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে জাতি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই এবং যাহারা পারলৌকিক জীবনকে অস্বীকার করিয়াছে আমি তাহাদের মিল্লত পরিহার করিয়াছি এবং আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীমের মিল্লতের অনুসারী হইয়াছি—৩৭ ও ৩৮ আয়ত।

انى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون -

ছুরত আলে-ইমরাণে মুছলমানদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, হে মুছলিম সমাজ, তোমরাই—শ্রেষ্ঠতম উম্মত, তোমাদিগকে বিশ্বজগতের মানব সমাজের জন্য উত্থিত করা হইয়াছে— ১১০ আয়ত।

كنتم خير امة اخرجت للناس -

ছুরত আলবাকারায় কথিত হইয়াছে যে, এইরূপে আমি তোমাদিগকে হে মুছলিম সমাজ, শ্রেষ্ঠতম উম্মতে পরিণত করিয়াছি যাহাতে তোমরা পৃথিবীর মানব সমাজের সাক্ষ্যদাতা হও—১৪৩ আয়ত।

وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس -

ভৌগলিক বা গোত্রীয় জাতীয়তার পরিবর্তে মিল্লত এবং উম্মতের অনুসরণ করার আদেশের তাৎপর্য এইযে, নির্দিষ্ট জীবনাদর্শ, শরীঅত ও সংবিধানকেই মিল্লত বলা হইয়া থাকে। ভৌগলিকতার পটভূমিকায় কোন জীবন দর্শন ও সংবিধানের স্থান নাই সুতরাং তাহার দিকে আহ্বান এবং উহার অনুসরণের কোন সার্থকতাই থাকিতে পারেনা। যেকোন দল, তাহা গোত্রীয়ই হউক অথবা চোর ডাকাতেরদল হউক অথবা ব্যবসায়ীদের হউক অথবা নির্দিষ্ট কোন জনপদের অধিবাসীদের হউক কিংবা ভৌগলিক দিক দিয়া একটি দেশ বা জন্মভূমির হউক উহা মানুষের ভিড় এবং জনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর ওয়াহী এবং নবীগণের দৃষ্টিভংগীতে এরূপ ভিড় ও জনতার কোনই মূল্য নাই। শেষোক্ত আয়তের সাহায্যে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, মুছলিমগণের উম্মত বা জাতীয়তা স্বয়ং আল্লাহর সৃষ্ট। ইহার বুনিয়াদে অন্য কোন বস্তুতান্ত্রিক উপকরণ—রক্তমাংস, মৃত্তিকা ও ভাষার অস্তিত্ব নাই। অথচ ভৌগলিক ও গোত্রজ জাতীয়তা যেরূপ হযরত নূহ ও হযরত মূছা প্রভৃতি পয়গম্বরের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া কোরআনে উল্লিখিত আছে তেমনি আদ ও ফিরআউন প্রভৃতি অনাচারী সম্রাটগণের সহিত সম্পর্কিত এই জাতীয়তার উল্লেখ কোরআনে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিভিন্ন ন্যাশনালিটি, রক্ত ও মৃত্তিকার সহিত সংশ্লিষ্ট জাতীয়তাকে পরিহার করিয়া যাঁহারা ইব্‌রাহীমের মিল্লতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইউরোপীয় পরিভাষার নেশন বা কওম (জাতি) নামে কোরআন ও ছুন্নাহর মধ্যে কুত্রাপিও উল্লেখ করা হয় নাই।

ফলকথা—মুছলিম সমাজের সংহতিকে উম্মত ব্যতীত অন্যকোন নামে কোরআন ও ছুন্নতের কোন স্থানে অভিহিত করা হয় নাই। উউরোপীয় পরিভাষার নেশন একদল মানুষের সমষ্টির নাম মাত্র। এই সমষ্টি বিভিন্ন গোষ্ঠি, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এবং নীতি নৈতিকতার সহস্র শ্রেণীতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে কিন্তু মিল্লত উপরিউক্ত বিভিন্ন দলগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া বাছিয়া লইয়া একটি নব পর্যায়ের সম্মিলিত সংহতিতে পরিণত করিবে। মোটকথা, মিল্লত অথবা উম্মত সমুদয় জাতীয়তার (Nationality) আকর্ষণকারী হইবে বটে কিন্তু কোন অবস্থাতেই স্বয়ং কোন জাতীয়তায় বিলীন হইবেনা। উম্মতে মুছলিমার বিরুদ্ধ শিবিরে শুধু একটি মিল্লতই বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, সকল শ্রেণীর সমুদয় কুফর একই মিল্লতের অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তানের আধুনিকতাবাদী ইছলামী আদর্শে অনভিজ্ঞের দল ইউরোপের অন্ধ অনুসরণের মোহে বর্তমানে ইছলাম ও কুফরের মধ্যে আপোষ ঘটাইয়া একটি অদ্ভুত জগাখিচুড়ী প্রস্তুত করার দুরাশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

الكفر ملة واحدة -

"নিজামুল-মুল্ক"

সগির (এম-এ,)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কিন্তু যোগ্যতার জ্বালা অনেক। মোরাদাবাদে গিয়া ভাল ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না করিতেই তাঁহাকে আবার দরবারে আহ্বান করা হইল (১৭১৮ খৃষ্টাব্দে)। এখানে আসিয়াই তিনি সম্রাটের নিকট হইতে এই গোপন প্রস্তাব পাইলেন যে, উজিরের পদে অধিষ্ঠিত সৈয়দ আবদুল্লাহ্ খাঁকে উৎখাত করার ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। অথচ এই কষ্টসাধ্য, এমন কি অসম্ভব ব্যাপার নিষ্পন্ন করার জন্য সম্রাট যে সব শর্তের আরোপ করিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, সম্রাটের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা একেবারেই অসম্ভব। তাই তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায় নির্বোধ ও অপরিনামদর্শী সম্রাটের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার ক্রোধভাজন হওয়ার পরিবর্তে তাঁহার নিকট মিষ্টমধুর বাক্যালাপে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। নির্বোধ সম্রাট ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়া নিজামুল্‌মুল্ককে চাকলা মোরদাবাদের ফৌজদারের পদ হইতে বরখাস্ত করিলেন। তাঁহার ন্যায় সম্মানীয় ব্যক্তির পক্ষে ইহা যে কতদূর অবমাননাকর তাহা শুধু ভুক্তভোগীরই বোধগম্য। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্যের সহিত ইহাও স্বীকার করিয়া লইলেন।

কালচক্র দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিল। সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয়কে পদচ্যুত বা খতম করার জন্য সম্রাট ফররোখশীয়রের সব প্রচেষ্টাই একের পর এক ব্যর্থ হইল। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক অনেক বিরুদ্ধবাদী আমীর ওমারা উজির সৈয়দ আবদুল্লাহর সহিত সখ্যতা স্থাপন করিলেন। সৈয়দ আবদুল্লাহও এই প্রকার সখ্যতা পরিবর্দ্ধনের জন্য আগাইয়া আসিলেন। নিজামুল-মুল্ককে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় কখনই অকপট প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু এক্ষণে এত বড় একজন শক্তিশালী নেতাকে অগ্রাহ্য করা বা তাঁহাকে অপাঙক্তেয় করিয়া রাখা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। তাই সৈয়দ আবদুল্লাহ্ খাঁ তাহার দুই ভাগিনেয় সৈয়দ গায়রত খাঁ ও সৈয়দ শুজাউদ্দৌলাহ্ খাঁকে সঙ্গে লইয়া নিজামুলমুল্কের আবাসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এর প্রতিদানে নিজামুল-মুল্কও উজিরের সম্মানার্থে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। এই উপলক্ষে উভয়পক্ষের মধ্যে মূল্যবান উপঢৌকনের আদান প্রদান হইল। উজিরের আগ্রহাতিশয্যে নিজামুল-মুল্ক বিহারের সুবাদার পদে নিযুক্ত হইলেন। (১৪১৯ খৃষ্টাব্দ)।

কিন্তু রাজনৈতিক দিকচক্রবালে যে ঝড়ের আভাষ পাওয়া যাইতেছিল, তাহা অচিরে পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইয়া শাসন সংগঠনে বিরাট ওলটপালটের সৃষ্টি করিল। উহার প্রকোপে ফররোখশীয়র সিংহাসন হারাইলেন, দিল্লীর রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে তাঁহার আবাস হইল জিন্দানখানায়। সৈয়দ ভ্রাতাদের হাতের ক্রীড়নক স্বরূপ দিল্লীর শাহী তখ্‌তে প্রতিষ্ঠিত হইলেন রফিউদ্দরজাত। নিজামুল-মুল্কের পাটনা গিয়া বিহারের সুবাদারী করা আর ঘটিয়া উঠিল না।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্ষমতা তখন নিরঙ্কুশ, প্রতিপত্তি অপ্রতিহত। এতদ্‌সত্ত্বেও দিল্লীতে নিজামুল-মুল্কের উপস্থিতি তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতার পথে কণ্টকের মত বিরাজ করিতে লাগিল। তাঁহাদের পথকে একেবারে নিষ্কণ্টক করার জন্য কনিষ্ঠ সৈয়দ একেবারে চরমপন্থা অবলম্বন করিতে চাহিলেন। নিজামুল-মুল্কের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানর জন্যই তিনি যেদ ধরিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অতটা চরমপন্থী ছিলেন না। তাঁহার ধারণা যে, নিজামুল-মুল্ককে দিল্লী হইতে দূরে সরাইতে পারিলে, তিনি স্বীয় বন্ধুবান্ধব ও অনুগত অভ্যাজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতঃই ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িবেন। পরিণামে

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই অভিমত বলবৎ হইল। নিজামুল-মুল্ককে মালওয়া বা মালবের সুবাদার পদে নিযুক্ত করিয়া দিল্লী হইতে নির্বাসিত করারই ব্যবস্থা করা হইল। তাঁহার কার্য্যস্থল হইতে তাঁহাকে আর খেয়াল খুশিমত ফিরাইয়া আনা হইবে না এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া তিনি তাঁহার সমগ্র পরিবার পরিজন ও অর্থ সামগ্রি লইয়া রাজধানী ছাড়িয়া কার্য্যস্থলের দিকে যাত্রা করিলেন। (১৫ই মর্চ্চে, ১৭১৯ খৃঃ)।

সৈয়দ ভ্রাতাদের কার্য্যকলাপের ফলে রাজনীতিতে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল, তাহা এই খানেই শেষ হইল না বরং উহা নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়া পরিণামে সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয়কেই ভাসাইয়া লইয়া গেল। উহার সূচনা হইল নিজামুলমুল্কের মধ্যস্থতায়। উজ্জয়নী হইতে "ওয়াকেয়া নবীস" দিল্লীর দরবারে সংবাদ পাঠাইলেন যে, মালওয়ার সুবাদার নিজামুলমুল্ক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সৈন্য ও যুদ্ধ সামগ্রী সংগ্রহ করিতেছেন। ফলে শাহী ফরমান জারী করিয়া নিজামুল-মুল্কের দিল্লীতে তলব হইল। ফরমানে আরও জানান হইল যে, শাসন সৌকর্য্যার্থে মালওয়ার শাসনভার দাক্ষিণাত্যের সুবাগুলির সহিত একত্রীভূত করিয়া সৈয়দ হোসেন আলির উপর অর্পিত হইল। আগ্রা, ইলাহবাদ, মুলতান বা বুরহানপুর এর মধ্যে যে কোন একটি সুবা বাছিয়া লইবার জন্যও নিজামুল মুল্ককে অনুমতি দেওয়া হইল। নিজামুল-মুল্ক ইহার মধ্যে ষড়যন্ত্রের আভাষ পাইয়া দিল্লী না আসিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন।

তারপর ঘটনাস্রোত খুব দ্রুত গতিতে আগাইয়া চলিল। সৈয়দপক্ষীয় দেলোয়ার আলী খান "পান্ধার" নামক স্থানে নিজামুল-মুল্কের সহিত যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত ও নিহত হইলেন। (১৯শে জুন, ১৭২০ খৃষ্টাব্দ), তারপর ঐ বৎসরেরই ১৯শে আগষ্ট তারিখে বালাপুরের যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে সৈয়দ হোসেন আলী খাঁর ডেপুটী তদীয় ভাগিনেয় আলীম আলী খানও পরাজিত ও নিহত হইলেন। এই সংবাদ আগ্রায় শাহী দরবারে পৌঁছার পর, তৎকালীন বাদশাহ মোহাম্মদ শাহের সমভিব্যাহারে হোসেন আলী খাঁ প্রায় ১ লক্ষ সৈন্য সহ নিজামুল-মুল্ককে দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সৈয়দ হোসেন আলীকে খতম করিয়া ফেলার জন্য তুরানীদের অন্যতম দলপতি মোহাম্মদ আমীন খাঁ চিনের নেতৃত্বে জনকয়েক প্রভাবশালী আমীর ওমারার মধ্যে একটি গুপ্ত ষড়যন্ত্র পাকিয়া উঠে এবং তাহার ফলে ৮ই অক্টোবর (১৭২০ খৃষ্টাব্দ) "টোডা ভীম" নামক স্থানে হায়দর বেগ কর্তৃক ছুরিকাঘাতে হোসেন আলী খান শিবির মধ্যে নিহত হইলেন। এই ভাবে সৈয়দদের বিপক্ষ দল জয়যুক্ত হওয়ায় মোহাম্মদ শাহ আর দাক্ষিণাত্যে গমন না করিয়া পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে হোসেন আলী খাঁর নিহত হওয়ার সংবাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল্লাহ খাঁর নিকট পৌঁছিলে তিনি শাহজাদা মোহাম্মদ ইবরাহিমকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাঁহার বিপক্ষদলের সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এর ফলে হাসানপুর নামক ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর ১৭২০ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে যে ভীষণ যুদ্ধ হইল তাহাতে সৈয়দ-পক্ষীয়েরা ভীষণভাবে পরাস্ত হইল এবং স্বয়ং আবদুল্লা খাঁ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। সৈয়দদের বিরোধী পক্ষের জয়জয়কার হইল। মোহাম্মদ আমীন খাঁ চিন বাহাদুর উজিরের পদে অভিষিক্ত হইলেন। দাক্ষিণাত্যে সংঘটিত এই সব ঘটনার কথা অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। কারণ এ সবের বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধান্তরে ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এর পরের ঘটনাগুলি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

নিজামুল-মুল্কের উজিরের পদে প্রতিষ্ঠা

ওজারতি লাভ করার পর ইতিমদ্দৌলাহ মোহাম্মদ আমিন খাঁ চিন বাহাদুর বেশী দিন বাঁচিয়া ছিলেন না। ঐ পদে মাত্র ৩ মাস তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। তারপর হঠাৎ গুরুতরভাবে পীড়িত

হইয়া তিনি ১৭২১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। এই প্রসঙ্গে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। জনসাধারণের ধারণা এই যে, জনৈক ফকিরের অভিশাপই তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কামার উদ্দিন খাঁ পিতার পরিত্যক্ত আসন দখল করার দাবী উপস্থিত করিলেন। অন্য পক্ষে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ তদীয় প্রিয়পাত্র খান দওরানকে ঐ পদ প্রদান করার গোপন ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। নিজের বিষয়ে নিরাশ হইয়া খান দওয়ান বাদশাহকে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন যে, নিজামুল-মুল্ককে দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরাইয়া আনিয়া উজিরের পদে অভিষিক্ত করা হউক। তদনুযায়ী নিজামুল-মুল্ককে উজিরের পদে নিযুক্ত করিয়া শাহী ফরমান জারী করা হইল এবং অবিলম্বে দিল্লী আগমন করার জন্য আহ্বান জানান হইল। যতদিন পর্য্যন্ত নিজামুলমুল্ক দিল্লী আসিয়া না পৌছেন ততদিন খান সামান এনায়েতউল্লাহ্ খান কাশ্মিরী উজিরের কর্ম্ম সম্পাদন করার ভার পাইলেন।

দিল্লীতে যখন এই সব ব্যাপার চলিতেছিল, নিজামুলমুল্ক সে সময় দাক্ষিণাত্যের চরমতম দক্ষিণ অংশ কর্ণাটিক ও মহিশূর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। সৈয়দ ভ্রাতাদের পতনের পর তিনি প্রথমতঃ দরবারে ফিরিয়া আসার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সব ব্যাপারের ন্যায় এ প্রসঙ্গেও হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইলেন না। বরং নানাবিধ চিন্তা করিয়া দরবারে গমন স্থগিত রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তৎকালে উজির মোহাম্মদ আমীন খাঁ চিনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। যদিও তাঁহারা উভয়ে একই বংশসম্ভূত এবং যদিও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বই বিরাজিত, তথাপি দরবারে নিজামুল-মুল্কের ন্যায় শক্তিশালী আমীরের অবস্থিতি তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। কারণ অপরকে অধিকৃত ক্ষমতার ভাগ দেওয়া মানবের স্বভাববিরুদ্ধ। এর জন্য পিতা সন্তানের প্রতিদ্বন্দ্বী হন ভ্রাতা ভ্রাতার শত্রু হন। সুতরাং এই সব কথা চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে এইরূপ পরিস্থিতিতে দিল্লী গমন করিয়া তথায় অনর্থক একটা বিপর্য্যয়ের সূচনা করিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র। কর্ণাট হইতে তদীয় রাজধানী আওরঙ্গাবাদে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি মোহাম্মদ আমীন খাঁর মৃত্যু সংবাদ ও তাঁর উজিরের পদে অভি-ষিক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইলেন। তথাকার শাসন ব্যবস্থার ভার তদীয় আত্মীয় ইওয়াজ খানের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি ১৭২১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দিল্লী যাত্রা করিলেন। তিনি বুন্দেলখণ্ডে পৌছিলে চান্দেরীর রাজা দুর্জ্জন সিংহ, দাতিয়ার রাজা রাও রামচাঁদ বুন্দেলা ও নারওয়ারের রাজা ছত্র সিংহ সসৈন্য তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মহা আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত দরবারে তাঁহাকে উজিরের পদে আনুষ্ঠানিক ভাবে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং এই উপলক্ষে তাঁহাকে মূল্যবান খেলাত, হীরা জওহারাত, মূল্যবান অঙ্গুরীয় ও মণিমুক্তাখচিত কলমদান প্রদান করা হয়। যমুনাতীরে অবস্থিত সাদুল্লাখানের প্রাসাদ বলিয়া পরিচিত বিরাট অট্টা-লিকাটিও তাঁহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্যক্ষেত্রে নিজামুল-মুল্কের পথ প্রথম হইতেই অতি দুর্গম ও বন্ধুর হইয়া উঠিল। সম্রাট অতিশয় দুর্ব্বল চরিত্রের লোক ছিলেন। প্রাসাদের খোজাদের দলপতি হাফিজ খিদমতগার খান এবং মোহাম্মদ জান নামক জনৈক যাদুবিদ্যাবিশারদের কন্যা রহিমুন্নেছাই মোহাম্মদ শাহকে পরিচালিত করিত। রহিমুন্নেছা সম্রাটের "কোকী" বা দুধভগ্নি নামে পরিচিত ছিল। ইহারা নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে প্রথম হইতেই বাদশাহকে নিজামুল-মুল্কের সম্বন্ধে বিরূপ করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহা ছাড়া দরবারের অন্যতম শক্তিশালী আমীর শামসউদ্দৌলাহ্ খান দওরানও অনেকটা প্রকাশ্য ভাবেই প্রতি কার্য্যে তাঁহার বিরোধিতা করিতে

লাগিলেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াইল এই যে, শাসনকার্য্যে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য তিনি যে পন্থাই অবলম্বন করিলেন তাহাই ব্যর্থতায় পর্য্যবশিত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নিজামুল-মুল্কের শিক্ষা-দীক্ষা বাদশাহ আলমগীরের সাহচর্যে সম্পন্ন হয়। শাসন কার্য্যে শুচিতা বিধান এবং প্রত্যেক ব্যাপারের খুঁটিনাটির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রদান উক্ত মহান সম্রাটের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজামুল-মুল্ক এক্ষণে শাসন কার্য্যের মধ্যে ঐ 'মডেল' প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিলেন। ঘুষ ও উৎকোচ গ্রহণের অবাধ স্রোত বহিতে থাকায় রাজনীতিতে দুর্নীতির অন্ত ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এর প্রধান আকর ছিলেন বাদশাহ নিজে। রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য কোন পদে নিয়োগ পাইতে হইলে সম্রাটকে অর্থ ভেট দিতে হইত। অবশ্য ইহার একটা গালভরা নামকরণ করিয়া উহার মধ্যে একটা সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার ভাব সৃষ্টি দ্বারা আত্মপ্রতারণার ব্যবস্থা করা হইত। কিন্তু আসলে উহা উৎকোচ ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। উহাকে "পেশকম" বা প্রথম ফল উৎসর্গ করণ নামে অভিহিত করা হইত। এর ফলে রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার পদপূরণের ব্যাপারে অবাধ দুর্নীতির স্রোত বহিতেছিল। নিজামুলমুল্ক সর্ব্ব-প্রথমে এই দুষ্টপ্রথা রহিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর একটা বিষয়ের সংস্কারেও তিনি হস্তক্ষেপ করিলেন। উহা হইতেছে জায়গীর প্রদান ব্যবস্থার বাড়াবাড়ি। পূর্ব্বে যে সব ভূখণ্ড খাস অধিকার ভুক্ত ছিল, উহা অধিকাংশই তখন শাহজাদা, শাহাজাদী ও আমীর ওমারাদিগকে জায়গীরস্বরূপ দান করা হইয়াছিল। ফলে ভূমিরাজস্ব আদায় দিন দিন হ্রাস পাইতেছিল। এর পরিণাম ফল এই দাড়াইয়াছিল যে, যাঁহারা রাজকোষ হইতে নগদ মুদ্রায় বেতন পাইতেন অর্থাভাবে তাঁহাদের নিয়মিত বেতন প্রাপ্তি বন্ধ হইয়া গেল। দীর্ঘদিন ধরিয়া বেতন বাকী পড়িতে থাকায় অনেক কর্ম্মচারী অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের অভাব অনাটন মিটাইবার প্রয়াস পাইলেন। আর দিনে দিনে তাঁহাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্যও খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। এক টাকায় ৭ সেরের বেশী খাদ্যশস্য পাওয়া যাইত না। একদা নিজামুলমুল্ক দরবারে আসিতেছেন। রাস্তায় একজন আসিয়া বলিতে লাগিল,—"আমি মহবত খাঁর বংশধর, আমার কিছু ব্যবস্থা করুন। আর একজন বলিল,—"আমি আলী মর্দ্দান খাঁর পৌত্র; আমার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।" আর জনসাধারণেরত কথাই নাই। তাহারা শিরে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া শুধু "ফরিয়াদ" "ফরিয়াদ" বলিয়া চিৎকার করিত এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাসের ব্যবস্থার জন্য দাবী জানাইত। এই বিশাল জনতার ভীড় ঠেলিয়া তাঁহার পক্ষে দরবারে গমনাগমন করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এই সব ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ এবং কি উপায়ে উহা বিদূরিত করা সম্ভব তাহার ছুফারিশ তিনি মোহাম্মদ শাহের সমীপে দাখিল করিলেন। সম্রাট বাহ্যিকভাবে সমস্তই অনুমোদন করিলেন কিন্তু উহা কার্য্যকরী করায় কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইল না। নিজামুল-মুল্কের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবেশিত হইতে লাগিল।

নিজামুল-মুল্কের বয়স তখন ৫০ বৎসর। আর সম্রাট তখন মাত্র ২০ বৎসরের তরুণ যুবক। তাই সম্রাট নিজামুল-মুল্কের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে "সেকেলে" বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার বেশভূষা ও আদব কায়দার রীতিনীতিকে পর্য্যন্ত বিদ্রূপ করা হইত। এমন কি কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে যে, একদিন প্রকাশ্য দরবারেই মোহাম্মদ শাহ নিজামুল-মুল্কের পোষাক দেখিয়া হাসিতে থাকেন। আর খান দওরান শামছমউদ্দৌলা এই বলিয়া উপহাস করেন—"দেখ, দেখ দাক্ষিণাত্যের মর্কটটীর নৃত্য দেখ।"

সুতরাং উজিরের পদলাভ করিয়া নিজামুল-মুল্কের অবস্থা কি প্রকার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এই সব ব্যাপার হইতেই উপলব্ধি করা যায়।

নিজামুল-মুল্ক কর্ত্তৃক সংস্কার প্রচেষ্টায় বিরতিদান

সংস্কার প্রচেষ্টায় নিজামুল-মুল্ক যাহা কিছু করিতে

উদ্যত হন বা যাহা কিছু প্রস্তাব করেন, তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ তাহার কদর্থ করিয়া সম্রাটের নিকট তাহা অবিশ্রাম ভাবে লাগাইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে নিজামুল-মুল্কের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোহাম্মদ শাহের মনে একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব জাগ্রত হয়। সম্রাট বয়সে তরুণ। তাঁর পার্শ্বচররূপেও তাহার চতুষ্পার্শ্বে জুটিয়াছিল যত সব বয়াটে প্রকৃতির এবং স্বার্থপর অকালকুষ্মাণ্ড তরুণের দল। তাহারা নিজেদের সার্থসিদ্ধির জন্য সম্রাটের উচ্ছৃঙ্খল ও নীতিভ্রষ্টতার সমর্থন করিত। তাই এই সব দুষ্কৃতিকারীদের কুপরামর্শের মূল্যই সম্রাটের নিকট অত্যধিক ছিল। বিচক্ষণ উজিরের কথা তাঁহার মনঃপূত হইত না। এই সব দুষ্কৃতি-কারীদের নিকট হইতে ক্রমাগত বিরূপ সমালোচনা শুনিতে শুনিতে মোহাম্মদ শাহের ধারণা জন্মিয়া গেল যে, নিজামুল-মুল্ক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে শাহজাদা ইবরাহিমকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। তাই তাহারা সম্রাটকে বুঝাইয়া দিল যে, নিজামুল-মুল্ক যাহাতে শক্তিসঞ্চয় করিতে না পারেন, তজ্জন্য তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা দরকার। অন্যদিকে এই বন্ধুত্বের মুখোশধারী মোনাফেকের দল সংগোপনে নিজামুল-মুল্কের নিকট গিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল যে, মোহাম্মদ শাহ একেবারে অপদার্থ; তিনি ভ্রষ্ট, পাপাচারী ও ব্যাভি-চারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সুতরাং এহেন অপদার্থকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তিনি কেন শাহজাদা ইবরা-হিমকে সিংহাসনে বসাইতেছেন না। ফলে সম্রাট ও উজির উভয়ে উভয়ের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। নিজামুল-মুল্ক নিয়মিত ভাবে দরবারে আগমন বন্ধ করিয়া দিলেন। আর যদি বা কোন সময় আসিতেন, তাহা হইলে সাবধানতার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়া তবে আসিতেন। সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করার কথা তিনি অবশ্য স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। কিন্তু তৎকালে উহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ আয়াস সাধ্য ছিল না। তুরাণীদলের অকুণ্ঠ সমর্থন তিনি পাই-তেন। আর দাক্ষিণাত্যের বিচক্ষণ কর্ম্মচারীরা তাঁহার সঙ্গেই ছিল।

দিনে দিনে অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকেই চলিল। সব কিছুর মধ্যে বিশৃঙ্খলা পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ছেলেখেলায় পরিণত হইল। রাজস্বের ব্যাপার মীমাংসিত হইতে লাগিল সৈন্যদের দ্বারা। আর কাজীর আসনে বসিল যত সব রাত্রের পাহারাওয়ালা। বাদশাহর বিভিন্ন সভাসদ ও প্রিয়পাত্রদের মধ্যেও ঈর্ষা ও স্বার্থের প্রতিযোগিতা হাতাহাতিতে গিয়া ঠেকিত। এই সব দেখিয়া শুনিয়া নিজামুল মুল্ক সকল প্রচেষ্টায় বিরতি দিয়া অবশেষে পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন। ক্রমশঃ

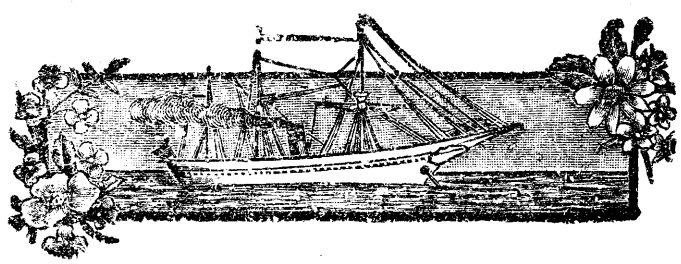

আগে চল্ আন্‌সার

—কাজী গোলাম আহমদ

আন্‌সার ! আন্‌সার !
ধর্ খর তরবার—
বিঘ্নের কারাগার
চূর্ণ করি চল্—গিরি-নদী-পারাবার—
আগে চল্—আগে চল্—আগে চল্ আন্‌সার।
পশ্চাৎ পানে মিছে
দৃষ্টি দিয়ে পিছে
রহিস্ না পড়ি' নীচে
দুষ্‌মণ-দিলে দিতে ত্রাসের সঞ্চার—
আগে চল্— আগে চল্— আগে চল্ আন্‌সার।
বাজে দূরে দুন্দুভি
খেলে সেথা খুন্-খুবী
যত পর-দেশ-লোভী
কর্ণে কি নাহি আসে তাহাদের হুংকার—
আগে চল্— আগে চল্— আগে চল্ আন্‌সার।
জালিমের 'জুল্‌মাত'
ইস্‌লাম 'পরে হাত
দিয়েছে যে 'কম্-বখ্‌ত'
যেন' তা'র হাতে তোর নাহি রয় নিস্‌তার—
আগে চল্— আগে চল্— আগে চল্ আন্‌সার।

শিরে বাঁধ্ আমামা
বাজা তোর দামামা
জ্বলে 'শাহাদত-শামা',
তোরা 'পাক-পরোয়ানা', সাথী 'পাক্-পরোয়ার'
ভয় নাই— আগে চল্— আগে চল্ আন্‌সার।
উঁচা রাখ্ সংগীন
খুনে রাঙা রংগীন
হয় হোক্, গম্‌গীন্
হোস্‌নাকো, ছুটে চল্— যথা আলী হায়দার—
আগে চল্— আগে চল্—আগে চল্ আন্‌সার।
আর্তের হাহাকার
জানানার আঁখিভার,
শহীদের লোহুধার
রোধিতে রুখে চল্ ধরি' 'জুল্‌ফিক্‌কার'
আগে চল্— আগে চল্—আগে চল্ আন্‌সার।
তোর নিশান ও নিশানা
কারো সনে মেশা না,
শান্তির পাক্-সেনা
শত্রুর সনে যুঝে মান রাখ্ বরাস্তার—
আগে চল্— আগে চল্— আগে চল্ আন্‌সার।

পশ্চিম পাকিস্তানে চব্বিশ দিন

—অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবীমুদ্দীন।

১৯৫২ সালের ৮ই অক্টোবর 'কুটুম্বিতা ভ্রমণে (Goodwill mission) উদ্দেশ্যে করাচী রওয়ানা হলেম। আমাদের দলে ছিলেন বিভিন্ন কলেজের দুইজন অধ্যক্ষ, তিনজন অধ্যাপক, তিনজন ছাত্র ও একজন স্কুল-শিক্ষক। শেষোক্ত ভদ্রলোক একজন মওলানা এবং লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে তালীম হাছীল করেছেন।

ঢাকার উড়ো জাহাজ ঘাটিতে দিনাজপুরের এক ভদ্রলোক দুটি ছেলে-মেয়ে সহ তার মেয়েকে আমার হেফাজতে দিলেন। হেফাজতে দেওয়ার অন্য কারণও ছিল। ছেলেটির বয়স বছর তিনেক, আর মেয়েটি মাত্র মাস ছয়েকের। বয়স্ক লোকের একখানা টিকেটে শুধু একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে লওয়া যায়। কাজেই তিন বছরের ছেলেটিকে আমার বরাদ্দ করে নিলাম। ছোট ছেলের জন্য আলাদা আসনের ব্যবস্থা উড়ো-জাহাজে নেই, কোলে বসিয়ে নিতে হয়। ছেলে-মেয়ে সহ একাই মহিলাটি তার স্বামীর চাকুরী-স্থল করাচী রওয়ানা হয়েছেন। তার স্বামী করাচীর উড়ো-জাহাজের ঘাঁটীতেই চাকুরী করেন।

সারাটা পথ ছেলেটিকে কোলে করে রাখলাম। কলকাতা ও দিল্লীতে উড়ো-জাহাজ ছেড়ে ওয়েটিং রুমে যাওয়ার সময় শিশুটিকে ঘাড়ে করে নিতে হলো। সারাক্ষণ ওদের তদারক নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম। মহিলাটি 'চাচাজী' বলে আত্মীয়তা পাতালেন আর ছেলেটি 'নানা' ডেকে বেশ জমিয়ে নিল।

পথে কুড়ানো এই 'নাতি-নাতনী আর ভাতি-জীকে' নিয়ে করাচীর হাওয়াই আড্ডায় পৌছে কিন্তু বেশ মুশ্‌কিলেই পড়লাম। রাত আটটায় আমরা করাচীতে পৌছলাম, তখন হাওয়াই আড্ডার আশে পাশে কোথাও 'জামাতা বাবাজীকে' খুঁজে পাওয়া গেল না। লোকজনের মধ্যে মহিলাটি তন্ন তন্ন করে তার স্বামীকে খুঁজলেন; নাতিকে কোলে নিয়ে আমিও পিছে পিছে ঘুরে হয়রান হলেম। আরও অসুবিধা হলো এই যে, করাচীর শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দল বেঁধে মালাহস্তে তাঁদের মশ্‌রেকী পাকিস্তানের কুটুম্বদের এস্তেকবাল করতে এসেছিলেন। দল ছাড়া হয়ে আমি নিজেই মহিলাটি সহ গরু-খোঁজার অবস্থায় পড়েছি। মালা হাতে করে তাঁরাও তখন আমার খোঁজ করতে শুরু করেছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সম্বর্দ্ধনাকারীরা আমার গলায় মালা পরিয়েছিলেন। কিন্তু তখন আমি বড় বিব্রত হয়ে পড়েছি। এই মুসাফিরির হালতে মহিলাটির কি ব্যবস্থা করি!

আমার কয়েকটি ছাত্রও আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল। আমার দশা দেখে তারাও মহিলাটির স্বামীর অনুসন্ধানে লেগে গেল।

আমাদের নিয়ে যাত্রার জন্য সরকারী মোটর তৈরী। অথচ মহিলাটির স্বামীর দেখা নাই। মহিলাটি বললেন, "চাচাজী, ওরা আপনার জন্য আর কতক্ষণ দেরী করবে? আপনি চলে যান। আমার নসীবে যা থাকে, তাই ঘটবে।" বললাম, "তা কি হয় মা! এই দূরদেশে রাত্রি বেলায় কোথায় তোমাকে ফেলে যাব। ওরা চলে যাক, তোমার ঠিকমত ব্যবস্থা না করে আমি যাচ্ছি না।"

আমাদের দলকে নিয়ে মোটর যখন ছাড়ে ছাড়ে সেই সময় জামাতা বাবাজী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। ঢাকা থেকে তাকে যে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, তা তিনি পাননি। আমার এক ছাত্র গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে খুঁজে বের করে। দৌড়ে গিয়ে মোটরে উঠলাম। হাওয়াই আড্ডা ছেড়ে করাচীর শহর-এলাকা প্রায় ১০। ১২ মাইল দূরে।

করাচীর হওয়াই আড্ডায় যারা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন, তাদের মধ্যে করাচীর জন-শিক্ষার ডাইরেক্টর জনাব ইমতিয়ায মহম্মদ খান,

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার জনাব আখ্‌তার হুসাইন, করাচীর সরকারী বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক-সমিতির সভাপতি জনাব বশীর আহ্‌মদ ছিদ্দিকী, সিন্ধুর মুসলিম কলেজের অধ্যক্ষ জনাব সৈয়দ গুলাম মুস্তাফা এবং সরকারী স্কুলের শিক্ষক সমিতির সম্পাদক জনাব নূরুল হুসাইন নক্‌ভীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

সরকারী মেহ্‌মানরূপে আমরা করাচীর বেশ বড় রকমের একটা হোটেলে স্থান পেলাম।

৯ই অক্টোবর সকালেই আমরা কায়েদে আযম ও কায়েদে মিল্লাতের কবর যিয়ারত করতে গেলাম। কবরে মাল্যদান করা একটা 'ফ্যাশনে' পরিণত হয়েছে। মওলানা আবুল কালাম আযাদও করাচী ভ্রমণের সময় কায়েদে আযমের কবরে মাল্য দান করেছিলেন বলে সংবাদপত্রে পড়েছি। দলের ডেপুটী লীডার হিসাবে কবরে মাল্য দান করার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করা হলো। আমি মাল্য দান না করে কীর্তিমান দুই মহাপুরুষের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোওয়া করলাম। করাচীর এই নির্জ্জন এলাকায় ৪০।৫০ ফুট উঁচু একটি বালির পাহাড়ের উপর দুই বন্ধু এবং সহকর্ম্মী অনন্ত নিদ্রায় শায়িত। কায়েদে আযমের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য এখনও পর্য্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ না হওয়ায় তার নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু হয় নাই! আর, কায়েদে মিল্লাত যিনি জাতির খেদমত করতে যেয়ে বুকের তাজা রক্তে পাকভূমি রঞ্জিত করলেন, আজ পর্য্যন্ত তাঁর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড রহস্যের আবরণেই আচ্ছাদিত রইলো!

সেদিন আমরা কতকগুলি সরকারী ও আধা-সরকারী কলেজ পরিদর্শন করলাম। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেও করাচী সিন্ধু-প্রদেশের রাজধানী ছিল। কলেজগুলির সব কয়টিই এখনও সিন্ধু-সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে রয়েছে। সকল কলেজেরই বেতনের হার অত্যধিক—মাসে ১৫৲ থেকে ২০৲ টাকা করে। ডি-জে কলেজে বি-এস্‌-সি পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়, কিন্তু আর্টের কোন বিষয় পড়ান হয়না। অধ্যক্ষ মিঃ শেখ্‌ প্রবীণ শিক্ষাবিৎ। প্রায় ত্রিশ বৎসর এই কলেজে তিনি অধ্যাপনা করছেন। প্রথমে লেক-চারাররূপে শিক্ষক-জীবন শুরু করেছিলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমে এই বিরাট কলেজের অধ্যক্ষ পদে বরিত হয়েছেন। তিনি বললেন, "নূতন রাষ্ট্র পাকিস্তানে এখনও আমরা বিরাট পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে চলেছি। ক্রমাগত ভুল করে আর ঠেকে শিখেই আমরা যেন যাচাই করছি আমাদের জন্য কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ।"

আমরা সিন্ধু ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজ ও সিন্ধু মুস্‌লিম কলেজ দুটি পরিদর্শন করলাম। ঢাকার কলেজের মতোই এগুলি। বিকালে আমরা 'উর্দু কলেজে' গেলাম। বিভাগ-কালের ওস্‌মানীয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মতো এখানে ইংরাজী গ্রন্থ উর্দুতে তর্জমা করে উর্দুর মারফতে এম-এ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করা হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দু কলেজের পরীক্ষা-মূলক প্রচেষ্টার পিছনে বহু অর্থ ঢাল্‌ছেন।

শহর হিসাবে করাচীর কৌলিন্যের দাবী নেই। আরব সাগরের বালুকাময় বেলাভূমিতে সিন্ধী, গুর্জ্জরাতী ও আরবী সওদাগরদের সমবেত প্রচেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যে গড়ে উঠেছে এই করাচী শহর। এর একদিকে আরবী দরিয়া আর অন্যদিকে সিন্ধুর বিরাট মরু এলাকা। শহর ছাড়িয়ে এগুলেই হয় জন বিরল অনুর্ব্বর প্রান্তর নতুবা তৃণ-লতাহীন মাটীর পাহাড়সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। গরমের দিনে প্রায় সকল সময় সমুদ্রের দিক থেকে বাতাস বইতে থাকে এবং সেই জন্য সিন্ধুর অভ্যন্তর ভাগের তুলনায় করাচীর আবহাওয়া অনেকটা মৃদু গোছের।

দেশ-বিভাগের বদৌলতে রাতারাতি করাচী হলো পাক-হুকুমতের রাজধানী। করাচীর দেহে নতুন করে ডেকে গেল যৌবনের জোয়ার। লোক-সংখ্যা চারি লক্ষ থেকে চৌদ্দ লক্ষে গিয়ে পৌঁছল। নতুন কর্ম্ম-চাঞ্চল্যে করাচীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফিরে এল প্রখর সজীবতা। নতুন নতুন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, শিল্পাঞ্চল, সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য বাসস্থান, স্কুল-কলেজ, আড্ডা-ক্লাব, হোটেল-রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠিত হলো। ভাগ্য-বিতাড়িত মোহাজেরদের জন্যও পাড়া

গড়ে উঠলো। করাচী এখন শুধু পাকিস্তানের রাজধানীই নয়, উহা মধ্য-প্রচ্যের শ্রেষ্ঠ বিমান-বন্দর এবং সমুদ্র-বন্দর।

পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য স্থানের মতো করাচীতেও সবুজের আভাস খুব কম। শহরে গাছপালা নাই বল্‌লেই চলে। সৌখীন লোকেরা গৃহাঙ্গনে দুর্ব্বাঘাস গজানর জন্যই দৈনিক দুবেলা পানী ছেঁচের ব্যবস্থা করে থাকেন। খেলার মাঠে পর্য্যন্ত ঘাস নেই, বালুকার সমারোহ। এদিকে সেদিকে দাঁড়িয়ে আছে বালিয়াড়ী—বালির পাহাড়।

করাচী শহরটি বেশ বড় ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলিও সাধারণতঃ চওড়া। পূর্ব্ব পাকিস্তানের মতো করাচীতে মাসের পর মাস ছিচ্‌কাঁদুনে বৃষ্টি হয়না এবং দালান-কোঠার রংও তাই বড়-একটা মলিন হয়না। বন্দর রোডটি করাচীর দীর্ঘতম ও বৃহত্তম রাস্তা। রাস্তাটি বেশ চওড়া এবং লম্বায় প্রায় দশ মাইল। বর্ত্তমানে এই রাস্তার একাংশের নাম-করণ হয়েছে—মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ রোড।

করাচীতে পৌঁছলে সর্ব্বপ্রথম যে জিনিষ মশ্‌রেকী পাকিস্তানের বাশিন্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে উটের গাড়ী এবং গাধার গাড়ী। গরু মহিষের গাড়ী তো আছেই, তবে সংখ্যায় সেগুলি অল্প। ঘোড়ার গাড়ীও আছে—যাকে 'ভিক্টোরিয়া' আখ্যা দেওয়া হয়। উটের গাড়ীগুলি সাধারণতঃ মাল-পত্র বহনের কাজে লাগে। একটা উটের পিঠনে প্রায় হাত পাঁচেক চওড়া ও হাত আটেক লম্বা কাঠের পাটাতন জুড়ে দিয়ে ঐ পাটাতনের তলায় দুজোড়া মোটরের চাকা লাগালেই উটের গাড়ী তৈরী হয়। উটের গাড়ীতে এক ট্রিপে ৫০।৬০ মণ পর্য্যন্ত মাল বহন করা হয়। খরচও নাকি বেশ কম, হাঙ্গামাও তেমন নেই। একজন মাত্র চালক গাড়ী চালায়। গাধার গাড়ী অনেকটা আমাদের দেশের এক্কা গাড়ীর মত। মালবহনের কিম্বা গরীব লোকদের আরোহণের কার্য্যে গাধার গাড়ী ব্যবহৃত হয়।

করাচীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে ক্লিফ্‌টনের সমুদ্র সৈকত, কেয়ামারীর বন্দর এলাকা, ফ্রিয়ার-হল, গান্ধী-গার্ডেন, বোল্টন বাজার প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। ক্লিফ্‌টন-সৈকত সত্যই খুব সুন্দর। সমুদ্র-তট জুড়ে এই স্বভাব-সুন্দর পার্কটির পরিকল্পনা করেছিলেন ইংরাজরা। ওদের রুচির প্রশংসা করতে হয়। কেয়ামারীতে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ ভিড়ে। জাহাজে মালবোঝাই ও জাহাজ থেকে মালনামানর কার্য্যের দরুণ এই এলাকা সর্ব্বদা কর্ম্ম চঞ্চল। কেয়ামারী থেকে নৌকা বা লঞ্চে উঠে মাইল খানেক সমুদ্র পাড়ি দিলেই ম্যানোরা দ্বীপে যাওয়া যায়; এই দ্বীপে করাচী বন্দরের বিখ্যাত 'বাতিঘর' ও নৌ-শিক্ষা কেন্দ্র অবস্থিত। প্রত্যহ বৈকালে ক্লিফ্‌টন-সৈকতে ও এই দ্বীপে অগণিত নর-নারীর সমাবেশ হয়। কর্ম্মক্লান্ত দিবসের শেষে সমুদ্রের হাওয়ায় নাগরিকগণ অপরাহ্নের অবসর-মুহূর্ত্তগুলি যাপনের জন্যই সমুদ্র-তটে আগমন করে থাকেন। ফ্রিয়ার-হলটি ফ্রিয়ার গার্ডেনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই হলটি করাচীর যাদুঘর। গান্ধী-গার্ডেন চিড়িয়াখানা। যারা কলকাতায় আলীপুরের চিড়িয়াখানা দেখেছেন, তাদের জন্য গান্ধী-গার্ডেনে দেখ্‌বার তেমন কিছু নেই। তবে গান্ধী-গার্ডেন করাচীর একমাত্র স্থান যেখানে এক সঙ্গে অনেকগুলি বড় বড় গাছপালা দেখা যায়। সমগ্র করাচীতে এই গান্ধী-গার্ডেনেই মাত্র একটা ছায়া-ঘন পরিবেশ দেখা যায়। গার্ডেনের মধ্যেই কয়েকটি আঙুরের বাগান। বানরের অত্যাচার থেকে আঙুর-ফসলকে রক্ষা করার জন্য একজন লোক মোতায়েন করা আছে। সে বানর-যুথ দেখ্‌লেই ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজিয়ে বানরদের জানিয়ে দেয়—"খবরদার!" করাচীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বোল্টন্ বাজারটি কলকাতার বড় বাজারের করাচী সংস্করণ, কেনা-বেচার বিরাট কেন্দ্র।

করচীতে মস্‌জিদের সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য, মুচ্ছল্লীর সংখ্যাও অল্প। ঢাকার সঙ্গে করাচীর এ পার্থক্যটা যে কোনো ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক সম্বর্দ্ধনা-সভায় যোগ দিয়েছি। সভার কাজ চলেছে তো চলেছেই। মগ্‌রিবের নামাযের ওয়াক্ত্ চলে

যায়। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, ইসলামী চাল চলন অবলম্বন সম্বন্ধে সভায় অনর্গল বক্তৃতার তুবড়ি ফোটে, অথচ নামাযের জন্য সভার কাজ বন্ধ হয়না! কচিৎ দু-একজন যাদের নামায পড়ার বদ-অভ্যাস (?) আছে, তারা উঠে গিয়ে নামায আদায় করেন। মশ্‌রেকী পাকিস্তানের কোনো শহরে বা গ্রামে এ-রকম ব্যাপার কখনই ঘটতে পারত না। অনেক বে-নামাযী নেতা, উপ-নেতা সভাসমিতিতে গেলে অন্ততঃ চক্ষু-লজ্জায় নামাযী হয়ে উঠেন! কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ এই চক্ষু লজ্জার বালাই কাটিয়ে উঠেছেন!

শহরের দ্রষ্টব্য স্থান এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু কিছু দেখলাম। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এদের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, সবগুলিই তৈরী হয়েছিল ব্রিটিশ-রাজের নির্দ্ধারিত ছাঁচে ঢালাই করে, আর গড়ে উঠেছিল তারই দাক্ষিণ্য পুষ্ট হয়ে। আমরা প্রস্তাব করলাম,—এ দেশের গ্রাম দেখতে চাই। আমাদের ভ্রমণের ইন্তেযামের দায়িত্ব যাদের স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল তাঁরা দু'একবার মাথা চুলকালেন,—তাই তো, গ্রাম কোথায়? করাচীর বাইরে যেদিকেই তাকাও, দেখতে পাবে দিগন্তপ্রসারী ধু ধু প্রান্তর কিম্বা রৌদ্র-দগ্ধ মাটীর পাহাড়! অবশেষে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তারা বললেন, "চলুন, মাঙ্গো-পীর দেখে আসবেন।"

১০ই অক্টোবর সকালে আমরা মাঙ্গো-পীর রওয়ানা হলেম। পীচ ঢালা রাস্তা। একবার রাস্তা তৈরী করতে পারলে দশ-পুরুষে আর তার পিছনে মেরামতী খরচ যোগাতে হয়না। রাস্তা বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়না, বন্যায় ভাঙ্গেনা। করাচীর শহর এলাকা পার হয়ে আর কোথাও জন-বসতির চিহ্ন, পানী, গাছপালা কিম্বা সবুজের নিশানা দেখলাম না। মাঝে মাঝে রোদেপোড়া গেরুয়া মাটীর পাহাড় মাথা নীচু করে রয়েছে। এই পাহাড়ের ফাঁকে ফোঁকরে দু'একটা কাপড়ের তাঁবু দেখা গেল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ঐগুলি গরীব সিন্ধী পরিবারের বাসস্থান। এরা ঘর তৈরী করতে পারে না—আর এই বৃক্ষলতাহীন এলাকায় ঘর তৈরীর সরঞ্জামই বা কই! আর এই এলাকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮। ১০ ইঞ্চির অধিক নয়। কাজেই তাঁবুতে থাকতে এদের অসুবিধা হওয়ারও কথা নয়।

মাঙ্গো-পীরে পৌঁছলাম। মাঙ্গো-পীরের দরগাহটি ছোট একটি টিলার উপর অবস্থিত। এই টিলার নীচে উষ্ণ পানীর প্রস্রবণ। এর পানীর নাকি রোগারোগ্য ক্ষমতা অসীম। এরূপ ক্ষমতা থাকাই স্বাভাবিক। কারণ পানীতে অনেক খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণ রয়েছে। দরগার ঠিক নীচেই পাকা-প্রাচীর ঘেরা একটি ছোট পুকুরে ২০।২৫টা কুমীর পড়ে রয়েছে। পুকুরে পানীও খুব বেশী নয়। কুমীরগুলি আকারে ছোট। এদের শরীর ও চেহারা দেখে মনে হয়, এরা এই জনবিরল স্থানে পর্য্যাপ্ত খোরাকও পায়না, আর এখানে থেকে এরা খুব সুখীও নয়। জনশ্রুতি এই যে, যে সকল জিন্‌পরী পীর ছাহেবের ইবাদতে বিঘ্ন উৎপাদন করত, তিনি তাদের ধরে রূহানী কুওতের বলে কুমীরে রূপান্তরিত করেছিলেন। সে যাই হোক, এই নদী-নালা-খাল-বিল হীন মরু-প্রান্তরে কুমীরের গোষ্ঠি যে কি করে বসবাস পত্তন করলো, সেইটাই আশ্চর্য্যের কথা! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য যে, চট্টগ্রামে হযরত বা-ইয়াযীদ বোস্তামীর মাযার সংলগ্ন পুষ্করিণীতে বৃহদাকারের অনেক কচ্ছপ আছে। সিল্‌হেটে হযরত শাহ্ জালাল আল-ইয়া-মানীর মাযার সংলগ্ন দীঘিতেও বহু গজার মাছের সমাবেশ দেখা যায়। পীর আউলিয়াদের কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে এই শ্রেণীর প্রাণীদের যোগাযোগের কি কারণ আছে, আলিমুল গায়ব আল্লাহ্ তায়ালাই তা অবগত আছেন।

দরগাহ ছেড়ে মাইলখানেক এগিয়ে গেলে বাজার এবং দাতব্য চিকিৎসালয়। এই বাজারের সংলগ্ন একটি স্থানে অনেকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ রয়েছে। এখানে সরকারী খরচায় কুষ্ঠরোগীদের নিবাস তৈরী করা হয়েছে। উষ্ণপ্রস্রবণের পানীতে গন্ধক মিশ্রিত থাকায়

উহাতে গোসল করলে কুষ্ঠরোগের যন্ত্রণার উপসম হয়। মেয়ে ও পুরুষ রোগীর জন্য পৃথক পৃথক গোছলখানা তৈরী করা হয়েছে। কয়েকটি ধর্ম্মশালাও দেখ্‌লাম। দেশবিভাগের পূর্ব্বে বিভিন্ন এলাকার দানশীল হিন্দু ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের বদান্যতায় এই আশ্রম বা ধর্ম্মশালা গড়ে উঠেছিল। ঐগুলি এখন প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ছোট একটিতে মাত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্য্য চলে।

মাঙ্গোপীর এলাকার স্থানীয় মাতব্বর জনাব মাহ্‌মুদ ছাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি উর্দু বল্‌তে পারেন। এখানকার প্রায় সকলেই উর্দু বুঝেন ও বল্‌তে পারেন, যদিও এদের মাতৃভাষা সিন্ধী। জনাব মাহ্‌মুদ আক্ষেপ করে বললেন, "আহা, যদি দু'একদিন আগে আপনারা আস্‌তেন, তবে আমাদের এলাকার কিছু কিছু সবুজ চেহারাও আপনারা দেখ্‌তে পেতেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে পঙ্গপাল এসে আমাদের সকল ফসল খেয়ে গেছে।"

পঙ্গপালের কথা খবরের কাগজে পড়েছি, কিন্তু ওদের চক্ষে দেখিনি। বললাম, "দু'একটা ফড়িং দেখাতে পারেন?" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই পারি। ফড়িংএর গোশ্‌ত খুবই মজাদার। গরীব লোকেরা ধরে ধরে জমা করে, করাচীতে নিয়ে ৩।৪৲ টাকা সের দরে বিক্রি করে আসে। আমরাও অনেকগুলি ধরে জমা করে রাখি, অন্ততঃ কয়েকদিনের গোশ্‌ত-তরকারীর ঝামেলা মিটে যায়।"

জনাব মাহ্‌মুদ তার বালক পুত্রকে হুকুম করলেন বাসায় গিয়ে আমাদের দেখানর জন্য কতকগুলি ফড়িং আনতে। বালকটি কাগজের ঠোঙায় ভ'রে ৫।৭টি ফড়িং এনে হাজির করলো। এদের চেহারা আমাদের দেশের ধানের জমির ফড়িংএর মতো। ধান পাকবার আগে এই ফড়িংগুলি কচিধানের সাদা অংশটুকু চুষে খায়। এদের পাদুটি হাঁটু-ভাঙার মতো; গায়ের রং সবুজ; লাফিয়ে লাফিয়ে চলে; আবার অল্প অল্প উড়তেও পারে। মাহ্‌মুদ ছাহেব যে ফড়িংগুলি দেখালেন তাদের রং ধূসর, আকারে এরা আমাদের দেশের ধেনো ফড়িংএর চাইতে ৪।৫ গুণ বড়। এই পঙ্গপাল যখন দলবেঁধে আকাশজুড়ে উড়ে আসে, তখন সূর্য্যের আলো ঢাকা পড়ে। এক একটী দলের পরিধি ৩০।৪০ মাইল। একটা বিরাট মাঠের ফসল শেষ করতে এদের ঘণ্টাখানেকের বেশী সময় লাগে না। শস্যের চারার পাতাগুলি এরা খেয়ে ফেলে। ডাঁটা ও কাণ্ডগুলি যা অবশিষ্ট থাকে, তাতে এদের বিষাক্ত লালা লাগায় পরবর্ত্তী ৩।৪ দিনের মধ্যে সেগুলি আপনা আপনি মরে যায়।

২।১ দিনের মধ্যে পঙ্গপাল ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। কিন্তু যাওয়ার আগে ওরা মাঠের বালুতে অসংখ্য ডিম পেড়ে যায়। উষ্ণ বালির তাপে সপ্তাহ খানেক পরে ঐ সকল ডিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাচ্চা-ফড়িং বেরিয়ে আসে। এদের পাখা একটু সবল হলেই এরাও দলবেঁধে উড়ে যায় মাঠের ফসলের সন্ধানে।

জনাব মাহ্‌মুদ বললেন, "এই কয়টা ফড়িং নিয়ে যান দেশে। ঘাস খেতে দিবেন, দেখবেন এরা কেমন তাজা হয়ে উঠে।" আমি তাকে আমাদের দেশের কচুরী পানার গল্প বললাম। কোন্ শ্বেতাঙ্গ সাহেব নাকি জার্ম্মানী থেকে একটি মাত্র কচুরী-চারা এনেছিলেন। অথচ আজ সারা পূর্ব্ব পাকিস্তানে তাদের বংশবৃদ্ধি হয়েছে। মিঃ মাহ্‌মুদ ছাড়লেন না। আস্‌বার সময় তিনি একরূপ জোর করে ঠোঙাটি হাতে দিয়ে বললেন, "নিয়ে যান। করাচীর হোটেলের বাবুর্চ্চীকে দিবেন। সে ঘি-য়ে ভেজে দিলে খেয়ে দেখ্‌বেন, কেয়া মজাদার!"

আমি হোটেল পর্য্যন্ত ঠোঙাটি এনেছিলাম। করাচী ছাড়বার সময় ঠোঙাটি ফেলে এসেছি। মজদার খাদ্য চেখে দেখবার লোভও হয়নি, সৌভাগ্যও হয়নি। —অসমাপ্ত।

মুছলিম শিক্ষার ধারা

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান।

ইছলামী শিক্ষার গুরুত্ব

জাহেলিয়তে নিমজ্জিত আরববাসীগণের হৃদয়ে ইছলাম শিক্ষার প্রতি আকুল আগ্রহ সৃষ্টি এবং উহার বিমল জ্যোতিতে তাহাদের অন্তরলোক উদ্ভাসিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—তাহাদিগকে এক মহীয়ান সভ্যতার স্রষ্টা এবং জগতের শিক্ষাদাতা ও দীক্ষাগুরুর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয়। জাতি হিসাবে প্রাক-ইছলাম যুগের আরববাসী লিখন ও পঠন বিদ্যায় মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নাই—এখানে সেখানে দুই একজন লোক কবিতা রচনা ও বক্তৃতা চর্চায় উৎসাহ প্রদর্শন করিলেও উহা দেশের অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার ব্যাপক অন্ধকারকে অপসারিত করিতে পারে নাই। আমাদের মহানবী মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নিজেও পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি সর্বপ্রথম যে ওহী আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেন উহাতে 'পড়া'র জন্যই প্রত্যাদিষ্ট হইলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং শিক্ষার গুরুত্ব, উহার কল্যাণপ্রসূ ফল এবং ফরযিয়ত সম্বন্ধে মুছলমানদিগকে বহু গুরুত্বপূর্ণ বাণী শুনাইলেন।

মুছলিম শিক্ষার উপাদান

মুছলিম ইতিহাসের সুপ্রভাত হইতেই মুছলমানগণ তাহাদের সামাজিক জীবনের অন্যান্য শাখার ন্যায় শিক্ষাকেও ধর্মের সহিত সংযুক্ত রাখিতেই অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের ধর্ম তাহাদিগকে ইহাই শিখাইয়া আসিয়াছে যে, মানুষকে তাহার স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য এবং মানবতার প্রতি দায়িত্ব প্রতিপালনে যে শিক্ষা অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত করিয়া তুলিবে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। প্রাথমিক যুগের মুছলমানগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যে জ্ঞানার্জনকে মুছলমানদের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা এমন এক সত্যোজ্জ্বল সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা যাহা তাঁহার মাধ্যমে আল্লাহতা'লা মানবজাতির কল্যাণ, মুক্তি ও মোক্ষলাভের জন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাই তাঁহারা এই প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান অর্জনের জন্য পরম আগ্রহে আগাইয়া আসে। এই শিক্ষাতেই ছিল তাহাদের ধর্মীয়, নৈতিক, আইনগত বিধিবিধান এবং ব্যাষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সকল প্রয়োজন ও সর্বসমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট পথনির্দেশ।

নিজে অক্ষর জ্ঞানলাভ না করিয়াও রছুলুল্লাহ (দঃ) লিখন ও পঠন বিদ্যার সম্প্রসারণের জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিলেন নিম্ন ঘটনা হইতেই তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। বদর যুদ্ধে বহু সংখ্যক মক্কাবাসী মুছলমানগণের হস্তে ধৃত হইয়া মদীনায় আনীত হয়। বন্দীদের মুক্তিমূল্য ৪০০০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা নির্ধারিত হয়। যাহারা এই অর্থ প্রদানে অক্ষম হয়, তাহাদিগের সম্বন্ধে রছুলুল্লাহ (দঃ) এই নির্দেশ জারি করিলেন যে, তাহাদের প্রত্যেককে মদীনার ১০ জন মুছলিম বালক-বালিকার শিক্ষাদানের পরিবর্তে মুক্তি দেওয়া হইবে। ছাত্রগণের এইরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের পরই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যায়েদ বিন ছাবিত—যিনি পরবর্তী জীবনে রছুলুল্লাহর (দঃ) কাতেবের কার্যে নিয়োজিত হন এবং কোরাণের বহু আয়াত লিপিবদ্ধ করেন—এই ব্যবস্থার সাহায্যেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে মদীনার ইয়াহুদীগণের মধ্যে প্রচলিত হিব্রু বর্ণমালা শিক্ষা লাভের আদেশও প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রাথমিক খলিফা চতুষ্টয়ের যুগে খেলাফতের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যে ইছলামী শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করার কার্যে আরববাসীগণের প্রতিভা ও কার্যক্ষমতা প্রযুক্ত হওয়ায় শিক্ষার প্রসার ও প্রগতি সাধনে খুব বেশী দূর অগ্রসর হইতে না পারিলেও ইছলামের মৌলিক নীতি এবং কোরআন ও হাদীছের শিক্ষাদানের কাজ অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। কোরআনের বিদ্যায় পারদর্শী ও ক্বারীবৃন্দ খেলাফতের সর্বপ্রান্তে প্রেরিত হন এবং খলিফার নির্দেশক্রমে জনগণের সহিত সংযোগ স্থাপন পূর্বক—বিশেষ করিয়া প্রতি শুক্রবার প্রধান প্রধান মছজিদগুলিকে কেন্দ্র করিয়া—এই গণশিক্ষা প্রচারের কাজ চালাইয়া যান।

উমাইয়া যুগে ব্যাপক আকারে প্রাথমিক শিক্ষা প্রব-

তিত হয় এবং মছজিদ সমূহ শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। পরে পৃথক শিক্ষাগার সমূহও প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুর ৬-বৎসর বয়সে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিয়মিত শিক্ষাদানের জন্য মছজিদে কিম্বা শিক্ষাগারে ভর্তি করান হইত। কোরআন মজিদের পঠনকে সর্বাগ্রাধিকার দেওয়া হইত, সঙ্গে সঙ্গে ওজুর পদ্ধতি, নামাজের ছুরা, দোওয়া দরুদ ও নিয়মকানুন এবং জামাতে নামায পড়ার অভ্যাস শিক্ষা দেওয়া হইত। হস্তলিপি, অঙ্ক, রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং অন্যান্য মহৎ জীবনের পূতচরিত্র ও পুণ্য কাহিনীর সহিতও শিক্ষার্থীদের পরিচয় লাভের ব্যবস্থা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকিত। বিখ্যাত কবিগণের শিক্ষাপ্রদ কবিতা পাঠনের ব্যবস্থাও এই প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বাদ পড়িতনা।

আব্বাসীয় খলিফাগণের রাজ্য শাসনকালে মুছলিম জগতে শিক্ষার প্রভূত উন্নতি ও ব্যাপক প্রগতি সাধিত হয়। খেলাফতের সর্বত্র দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায় একদিকে যেমন ব্যবসায় বাণিজ্যে অসাধারণ উন্নতি এবং আর্থিক সমৃদ্ধি সর্বক্ষেত্রে প্রাচুর্যের বান ডাকিয়া আনে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষায় ব্যাপক প্রসার ও বহুমুখী প্রগতির ফলে আত্মিকক্ষেত্রেও এক চমকপ্রদ অভিব্যক্তি পরিদৃষ্ট হইতে থাকে। এই যুগেই মুছলমানগণ প্রাচীন গ্রীস, পারস্য ও ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ভাবধারার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে মুছলিম শিক্ষা ও সভ্যতা এবং ইছলামী নীতি ও ভাবধারাও উক্ত দেশ সমূহে প্রচারিত হইতে থাকে। ভাবের এই আদান প্রদানের ফলে মুছলমানগণের আকিদার স্বাতন্ত্র্য ও ইছলামী ভাবধারার বৈশিষ্ট্য অনেক স্থলে প্রভাবিত এবং ক্ষুন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক এবং অন্যান্য জাগতিক জ্ঞান ও চিন্তাধারায় তাহাদের হৃদয়ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য স্থাপিত মাদ্রাসা বা কলেজ সমূহের পাঠ্য তালিকায় এই আদান প্রদানের সুস্পষ্ট ছাপ প্রতিফলিত হয়। এই সব উচ্চ শিক্ষাগার সমূহে যে শিক্ষা প্রদান করা হইত উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—১ম আল-উলুমুন্ নাকলিয়া (العلوم النقلية) বা ধর্মীয় শিক্ষা, যথা কোরআন, হাদীছ, আইন, সাহিত্য প্রভৃতি। দ্বিতীয়, আল-উলুমুল আকলিয়া—(العلوم العقلية) বা বুদ্ধিগত শিক্ষা—দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি।

খেলাফতের কেন্দ্রীয় রাজধানী শুধু বাগদাদেই শিক্ষার এই ধারা অনুসৃত হয় নাই। বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অন্যান্য বৃহৎ সহরসমূহের প্রতিষ্ঠিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও কম বেশী ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা হয়। নিযামিয়া, মুছতানছারিয়া এবং আল আয্হার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে।

মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে, শুরু হইতেই মুছলিম শিক্ষা প্রণালী ইছলামের ধর্মীয় প্রকৃতি ও নৈতিক উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। কোন সময়ই উক্ত শিক্ষা এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত অথবা ধর্মীয় প্রভাবশূন্য হইয়া পড়ে নাই। ইছলামের বিশিষ্ট ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই উহার সিলেবাস বা পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত হইত। কখনই উক্ত পাঠ্য তালিকায় পার্থিব ও অপার্থিব শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অঙ্কিত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে কোন সত্যকারের মুছলিম সমাজে এমন উদ্ভট প্রশ্ন উত্থাপিতই হইতে পারেনা। কারণ ইছলামে ধর্ম জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, উহা জীবনের সহিত ওতপ্রোত ভাবে সম্পর্কিত। কতিপয় ধর্মীয় মতবাদের ও উপদেশ বাণীর একত্র সন্নিবেশের নাম ইছলাম নয়। ইছলাম মুছলিম—জীবনের সর্বক্ষেত্র ও সকল স্তরের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যাপারকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। বলাবাহুল্য শিক্ষার ন্যায় মুছলিম জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কস্মিনকালে খাঁটি ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত ও অনুরঞ্জিত না হইয়া পারেনা। সুতরাং একথা বুঝা মোটেই শক্ত নয় যে, ধর্মীয় শিক্ষা মুছলমানগণের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যতালিকায় চিরদিন কেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বিবেচিত এবং শিক্ষার প্রথম ও

শেষ কথার মর্যাদাপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে – আর কেন মুছলিম ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার কারিকুলামে উহা শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তরাত্মারূপে স্বীকৃতি পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের মুছলিম ছুলতান ও সম্রাটগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শুধু—শ্রেষ্ঠ বিজয়ী, ক্ষমতামত্ত শাসক এবং মহান অট্টালিকা-নির্মাতারূপেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন নাই, তাঁহারা তাঁহাদের সুপরিব্যাপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যাচর্চ্চার উদার পৃষ্ঠপোষক এবং সাধারণ শিক্ষার পরম উৎসাহদাতারূপেও বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের কাহারো কাহারো রাজত্বকালে শিক্ষা দীক্ষা এবং সাহিত্যিক সৃজনশীলতায় যথেষ্ট প্রগতি সাধিত হইয়াছিল। সম্রাট এবং তাঁহাদের আমির ওমারা দেশের সর্বপ্রান্তে অসংখ্য মক্তব ও মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যে মছজিদ সমূহই ব্যবহৃত হইত এবং শিক্ষার কারিকুলামে ধর্মীয় শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইত। লিখন, পঠন ও অঙ্ক (3 'R's—Reading, Writing & Arithmetic) প্রাথমিক শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইত। মাদ্রাছা সমূহ উচ্চ শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট ছিল এবং ঐগুলি প্রধানতঃ মছজিদ এবং ওলি আওলিয়ার দরগাহর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিত। কোরআন, হাদীছ, ফেকাহ, কালাম প্রভৃতির শিক্ষা ছাড়াও পার্থিব জ্ঞানমূলক বহু বিষয় মাদ্রাছার পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমাজ-বিজ্ঞান এবং ধর্ম-বিজ্ঞান দুই-ই ওতপ্রোত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই ভাবে ধর্মীয় ও লৌকিক উভয়বিধ শিক্ষার ভিতর সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল।

মাদ্রাছার স্থাপয়িতাগণ কর্তৃক উহাদের পরিচালনা ও ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি ওয়াকফ্ করিয়া দেওয়া হইত। এই ওয়াকফ্ সম্পত্তির আয় হইতে অধ্যাপকগণকে বেতন এবং ছাত্রবৃন্দকে বৃত্তি প্রদান করা হইত। এই ধরণের মাদ্রাছা ছাড়াও মোগল সম্রাটগণ শিক্ষা-প্রসারের জন্য অন্য উপায়ও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সরকারী রাজস্ব হইতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রসিদ্ধ মনীষী ও পণ্ডিতবৃন্দের জন্য নিয়মিত অর্থ মনজুর করিতেন। ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাঁহারা যেন সাংসারিক চিন্তা হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া সমস্ত মনে প্রাণে শিক্ষা দানের পবিত্র কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। এই ব্যাপারে হিন্দু ও মুছলমান পণ্ডিতবৃন্দের মধ্যে কোন তারতম্যের নীতি অনুসৃত হইতনা। এই মর্মের শাহী ফরমান আজও কোন কোন পরিবারে সুরক্ষিত রহিয়াছে। সম্রাট জাহাংগীর মাদ্রাছা সমূহের সুপরিচালনার নিমিত্ত আরো একটি উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি এই মর্মে এক ফরমান জারী করিয়াছিলেন যে, কোন ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি উত্তরাধিকারী না রাখিয়া অথবা কোন বিশেষ মর্মে উইল না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার ভূসম্পত্তি সরকারী তত্ত্বাবধানে চলিয়া যাইবে এবং উহার নিয়মিত আয় মাদ্রাছা এবং ওলী আউলিয়ার চিকিৎসাকেন্দ্রের সংরক্ষণের জন্য ব্যয়িত হইবে। এই ফরমানের শুভ পরিণাম স্বরূপ অর্থাভাবে ধ্বংস-প্রায় পুরাতন বিদ্যালয় সমূহ নূতন ভাবে উৎসাহী ছাত্র এবং শিক্ষকগণ কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত ও সুপরিচালিত হয়। শাহান শাহ জাহাংগীর তাঁহার সুবিখ্যাত স্মৃতি কথায় [Memoirs] আগ্রার শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন—

"The people of this place have a thirst for knowledge, so that scholar of every creed & community have gathered there in large numbers" অর্থাৎ এই রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ জ্ঞান পিপাসায় আকুলিত হইয়া শ্রেণী ধর্ম নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যায় এই শহরে সম্মিলিত হইয়াছে।

শুধু সম্রাট ও ছুলতানগণই যে জ্ঞানচর্চায় উৎসাহদান এবং শিক্ষা-বিস্তারের মহৎ কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন তাহাই নহে, রাজ্যের আমীর ওমারা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও এই কাজে একে অপরের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতেন। আরো লক্ষণীয় বিষয় এইযে, সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি-পুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রাজ্যের বহু মনীষী

ও স্বাধীন স্বাধীন প্রচেষ্টা ও বেসরকারী অর্থানুকূল্যে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া জ্ঞান-বিস্তারের পবিত্র কাজে তাঁহাদের জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন।

বৃটিশ ভারতে শিক্ষা

ইংরাজদের হাতে রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে আমাদের দেশ পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে আসিয়া পড়ে এবং এই প্রভাব জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে অল্পাধিক অনুভূত হইতে থাকে। কোম্পানী সরকার তাহাদের রাজত্বের প্রথম দিকে প্রজাবৃন্দের শিক্ষার ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেন। দেশীয় লোকদের শিক্ষাদানকে কোম্পানী নিজেদের দায়িত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের Charter Act অনুসারে সর্বপ্রথম এতদ্দেশীয় সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও উন্নতিসাধন এবং দেশীয় বিদ্বানগণের উৎসাহদান কার্যকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ম্যাকোলের রিপোর্টে [Lord Macaulay's Minute] হিন্দু ও মুছলমানদিগকে দেশের শাসন ব্যবস্থায় সহায়তা করার উপযুক্তরূপে গড়িয়া তোলার কার্যকে শিক্ষার—উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ একটি প্রস্তাবে ঘোষণা করেন : The great object of the British Government ought to be the Promotion of European literature & Sciences among the natives of India and that the funds appropriated to education would be best employed in English education alone., অর্থাৎ ভারতবাসীগণের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারই বৃটিশ সরকারের মহৎ উদ্দেশ্যরূপে সুনির্ধারিত হওয়া উচিত এবং শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট অর্থ একমাত্র ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইলেই উহা অধিকতর সুফলপ্রসূ হইবে। এইভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াই শিক্ষার নীতি নির্ধারিত হয় এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্যার চার্লস উড (Sir Chirls Wood) এর ডেসপ্যাচে যাহা ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার 'ম্যাগ্‌নাকার্টা' নামে পরিচিত—উহা স্থায়ীভাবে গৃহীত ও বলবৎ করা হয়। ইহার পর শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনার জন্য বহুবার বহু কমিটি নিয়োজিত এবং তাহাদের রিপোর্ট পেশ করা হয়। অবশেষে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নিয়োজিত হার্টগ—(Hartog) কমিটি এই ছুফারিশ পেশ করেন যে, ইছলামী কৃষ্টি ও ধর্মশিক্ষা দানের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা মুছলমানদের বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষেই ক্ষতিকারক এবং উক্ত বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদিগকে সাধারণ স্কুল ও কলেজের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করার চেষ্টায় ব্রতী হওয়ার ইহাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। *

নূতন শিক্ষা-প্রকরণে বাধ্যতামূলক বিষয়রূপে ইংরাজী শিক্ষার সহিত আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তিত করিলেও পাঠ্য তালিকায় পুরাতন পদ্ধতির ভিত্তি স্বরূপ ধর্মীয় শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়। এই বিপ্লবমূলক পরিবর্তন সমাজ জীবনে সুদূর প্রসারী ফল বহন করিয়া আনে।

ব্রিটিশ শাসকবৃন্দের এই পদ্ধতি অবলম্বনের পশ্চাতে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তাহারা ইংরাজীকে অন্যতম বাধ্যতামূলক বিষয়রূপে এই জন্যই প্রবর্তন করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন ইহার মাধ্যমে অধিকসংখ্যক ইংরাজী অভিজ্ঞ লোককে শাসন কার্য নির্বাহের জন্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন। বহুধর্ম, শ্রেণী ও সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই বিশাল সাম্রাজ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের প্রেরণা হইতেই তাঁহারা সাধারণ শিক্ষাগার সমূহে ধর্মমূলক বিষয় ও ধর্মীয় শিক্ষা বর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতেন।

ইহা হইতে পরিষ্কার উপলব্ধ হইবে যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুছলমানদের উপর তাহাদের আদর্শ বিরোধী

* "The committee came to the conclusion that the continuance of the special schools (in wihch the courses included teaching in Islamic culture & Religion) on a larger scale is prejudicial to the interests of Muslims" & "the time is ripe & more than ripe for a determind effort to devise political plans to transfer the peoples to ordinary schools & colleges.

ও মনস্তত্ত্বের সহিত অসমঞ্জস শিক্ষা পদ্ধতি চাপাইয়া দিয়া এক বিষম অবিচার করিয়াছিলেন। শিক্ষার নৈতিক ও ধর্মীয় দিক সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হওয়ায় উহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মুছলমানগণ তাহাদের সাংস্কৃতিক মূল্যমানের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় দুইটি স্পষ্ট ও পরস্পর-বিপরীত শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সমাজের প্রগতিশীল ও চিন্তাবিদ অংশ এই আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেও তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুভব করিলেন যে, একটি অত্যাবশ্যক ব্যাপারে উহার মারাত্মক ত্রুটী অনস্বীকার্য। যে ধর্মীয় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মানসপটে প্রয়োজনীয় নৈতিকবোধ এবং ধ্যান ধারণায় একটা পবিত্রতার ভাব আনয়ন করিত, নূতন ব্যবস্থায় উহারই অবলুপ্তি তাঁহাদের অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিল। তাঁহাদের চক্ষে ইহা সত্যই অত্যন্ত বিষদৃশ ঠেকিল। ধর্মীয় ভিত্তিশূন্য এই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় স্পষ্টতই নীতি নৈতিকতার উপাদান অবলুপ্ত হওয়ায় উহা একান্তই প্রাণশূন্য প্রমাণিত হইল। তাঁহারা দুইটি উপায়ে এই মারাত্মক ত্রুটির সংশোধন করিতে চাহিলেন। প্রথমতঃ পুরাতন প্রকরণের মাদ্রাছা-শিক্ষা—যাহার পাঠ্যতালিকা ধর্মমূলক বিষয়ে ভারাক্রান্ত ছিল তাহাই—যতদূর সম্ভব সংরক্ষণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই পুরাতন পদ্ধতির মাদ্রাছা শিক্ষা সরকারী সাহায্য-নিরপেক্ষ অবস্থায় অতি শোচনীয় আর্থিক সঙ্কটের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইতে লাগিল। আজও পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে এই সব মাদ্রাছা তাহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব কোনরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

পুরাতন পদ্ধতির মাদ্রাছা শিক্ষার প্রতীকরূপে আজও পাক-ভারতের সুবিখ্যাত নাদ্‌ওয়াতুলউলামা (লক্ষ্ণৌ), দারুল-উলুম (দেওবন্দ), জামিয়া-ই-আশরাফিয়া (লাহোর), জামিয়া-ই-মোহাম্মদী (ঝঙ্গ), দারুল-উলুম-ই-ইছলামিয়া (হায়দরাবাদ, সিন্ধু) আজও স্বমহিমায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে জাতির গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের আন্‌যাম দিতেছে। কিন্তু উহাদের পাঠ্যতালিকায় ধর্মীয় বিষয় সমূহের সহিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির যথাযথ সমাবেশ না থাকায় উহা অতি প্রাচীনপন্থী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে ইংরাজী শিক্ষিতদের নিকট বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

এই প্রসঙ্গে পাঞ্জাবে মুছলিম শিক্ষার প্রসার কার্যে আঞ্জুমানে হিমায়তে-ইছলামের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লাহোরের বুকে মাত্র ৫০০৲ টাকা লইয়া কার্য শুরু করিয়া আজ উহা—পাকিস্তানের বৃহত্তম একটি ছাত্রকলেজ, একটী প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীকলেজ, ৫টী বালকস্কুল একটী বালিকাস্কুল, একটী তিব্বিয়া কলেজ, একটী বালক এতিমখানা, একটী বালিকা এতিমখানা এবং ধর্মীয় সাহিত্য ও পাঠ্য পুস্তক আর সুদৃশ্য ও নির্ভুল কোরআন মজিদ প্রকাশনার জন্য সুবৃহৎ প্রকাশনী বিভাগ সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। আঞ্জুমান পরিচালিত প্রতিটী স্কুল ও কলেজ ধর্মীয় শিক্ষাকে পাঠ্যতালিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আঞ্জুমানের অনুকরণে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সহরে অনুরূপ বহু স্কুল গড়িয়া উঠিয়াছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান পর পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার পরিচালিত অথবা সরকারী সাহায্যপুষ্ট সাধারণ স্কুল এবং মুছলিম জনগণ পরিচালিত ইছলামী স্কুল সমূহের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অনেকটা ঘুচিয়া গিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা-বিভাগ সমূহ দ্রুতগতিতে সাধারণ শিক্ষার কারিকুলামে ধর্মীয় শিক্ষা প্রবর্তন করিয়া এই পার্থক্য দূরীকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইছলামিয়াত বা ইছলামী ইতিহাস ও কৃষ্টি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব হইতেই ইছলামিক স্টাডিজ্ বিভাগে কোরআন, তফছীর, হাদীছ, ফেকাহ, কালাম প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু উহার সহিত ইছলামী

ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান এবং মুছলমানগণের বৈজ্ঞানিক, তামাদ্দুনিক অগ্রগতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তরভুক্ত না থাকায় ইছলামী শিক্ষার ব্যাপক সার্থকতা ব্যাহত হইতেছে; পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইছলামিয়াত বিভাগে তফ্ছীর, হাদীছ, ফেকাহ প্রভৃতির সহিত উপরোক্ত বিষয় সংযোজিত করিয়া উহার ত্রুটী সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। একথা কখনই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, এক মহীয়ান ধর্মীয় ব্যবস্থা ও গরীয়ান জীবন বিধান এবং সমগ্র মানবতাকে উন্নততর সভ্যতার স্তরে আগাইয়া নেওয়ার এক প্রাণবান শক্তিরূপে ইছলাম উহার অনুসারীদের আদর্শভিত্তিক সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক মননশীলতার অগ্রগতিকে অস্বীকার করিতে পারেনা। ইছলামকে শুধু তত্ত্বগত ভাবে বুঝিবার চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। আমাদিগকে অবশ্যই মুছলমানদের জীবনে উহার কার্যকরী প্রভাবের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং এই কাজ সন্তোষজনক ভাবে তখনই সুসম্পন্ন হইতে পারিবে যখন আমরা ইছলামী কৃষ্টি ও তমদ্দুনকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবনের চেষ্টা করিব।

মুছলিম জগতে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব

পূর্বেই বলা হইয়াছে ইছলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয়, প্রকৃত প্রস্তাবে উহাই ছিল প্রধানতম উদ্দেশ্য। আলবারুজী ধর্মীয় উদ্দেশ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিতেছেন: "আল্লাহর শুভেচ্ছা এবং সন্তুষ্টি অর্জন করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য।" ইছলামের দার্শনিক গুরু ইমাম আল-গাযযালী "ফাতিহাতুল-উলুমে" শিক্ষাদানের পবিত্র কার্যকে এক প্রকার এবাদতরূপে মন্তব্য করিয়াছেন। শিক্ষানীতির ভিতর পার্থিব স্বার্থবোধ প্রবেশ করিলে উহা নিষ্ফল হইয়া যাইবে। তিনি বলেন, "যে শিক্ষার্থী অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে কিম্বা সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ অথবা ছুলতানের প্রতি দায়িত্ব এড়াইবার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করে, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব বরণ ভিন্ন অন্য কোন উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষালাভে ইচ্ছুক হয় সে এক অশুভ পরিণতির দিকেই নিজেকে আগাইয়া দেয়।" প্রকৃত প্রস্তাবে ইছলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানার্জনের প্রধানতম লক্ষ্যই ছিল আল্লাহর আনুগত্য নিজে শিক্ষা করা এবং সাফল্যের সহিত ইহলৌকিক জীবন পরিচালনা ও পারলৌকিক জীবনের জন্য প্রস্তুতির পন্থা মানুষকে শিক্ষা দান করা।

শিক্ষার আধুনিক মতবাদ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণ নিচয়ের পূর্ণ বিকাশকে শিক্ষা সাধনার যথার্থ লক্ষ্যরূপে মানিয়া লইতে চায়। ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, মানবীয় সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের অন্যতম প্রধান উপকরণ হইতেছে ধর্ম। সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষা স্বভাবতই স্কুল কারিকুলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিতে বাধ্য। ধর্মকে যাহারা জাতীয় জীবনের অত্যাবশ্যক এবং স্থায়ী উপাদান রূপে স্বীকৃতি দিতে নারায, তাহাদের পক্ষেই উহার গুরুত্ব অস্বীকার করা সম্ভবপর। ধর্মীয় ও লৌকিক শিক্ষার মধ্যে অতীতে কস্মিনকালে কোন সীমারেখা টানা হয় নাই। আজ কেন এই প্রশ্ন নূতন করিয়া উত্থাপিত হইবে তাহা বুঝা সত্যই দুষ্কর।

শিক্ষার ইছলামী আদর্শ

ব্রিটিশ আমলে সাম্রাজ্যিক স্বার্থের তাকিদে শিক্ষার্থীকে পুরাপুরি লৌকিক শিক্ষা প্রদান করা হইত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আজ শিক্ষার লক্ষ নূতন ভাবে স্থির করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে—বর্তমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নূতন করিয়া আমাদের শিক্ষা নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত।

১৯৪৭ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনেই প্রচলিত ইংরাজী শিক্ষার অশুভ পরিণতি এবং মুছলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতিবিরোধী বিজাতীয় কৃষ্টি এবং উহার সামাজিক ও নৈতিক—মূল্যবোধের বিপরীতমুখিতার কথা স্বীকার করা হয়। সম্মেলন এই জন্যই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের শিক্ষা পদ্ধতি ইছলামী আদর্শবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্য কথায় চরিত্রের উন্নতি এবং অন্তরনিহিত শক্তি নিচয় ও গুণাবলীর সুবিকাশের উপর বিশেষ যোর দিতে হইবে। কারণ যে শিক্ষায় চরিত্র গঠনের চেষ্টা নাই উহা শিক্ষা নয়— শিক্ষার কলংক। প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের অন্তরে এই উপলব্ধির ভাব

জাগ্রত করিবে যে, তাহারা বিশ্ব মুছলিম ভ্রাতৃত্বের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাহাদিগকে সর্ব সময় ও সর্বত্র লোক সমক্ষে ইছলামী নীতিকে উঁচু করিয়া ধরিতে হইবে এবং ইছলামের সুনির্ধারিত জীবনমান—যাহার নযির অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা অথবা সমাজ দর্শনে মিলিবে না—অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। সর্বোপরি নূতন বৃহত্তম মুছলিম রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিকরূপে তাঁহাদের স্কন্ধে যে বিরাট দায়িত্ব বর্তিয়াছে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে সদা সচেতন ও কর্তব্য সজাগ করিয়া রাখিবে। শিক্ষাকে ধর্মের সহিত সম্পর্কশূন্য রাখিয়া এই মহান উদ্দেশ্যের কৃতকার্যতার আশা বাতুলতা নয় কি?

কোন কোন মহল হইতে এমন অভিযোগ শ্রুতিগোচর হয় যে, আধুনিক শিক্ষা ইছলামের সংগে সামঞ্জস্যবিহীন। ইছলামের প্রকৃতি ও উহার তাৎপর্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই এই অভিযোগের ভিত্তি। এই ভ্রান্তি হইতেই অনেক সরল-মনা ব্যক্তি অনেক সময় ইছলামের আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। এই প্রসংগে 'অন্য পরে কা কথা' খৃষ্টান লেখক লর্ড ক্রমারের [Lord Chromer] একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান উক্তি উধৃত করাই যথেষ্ট মনে করি। তিনি বলেন, : If Islam were modernised, it would cease to be Islam. ইছলামের যদি আধুনিক সংস্করণ বাহির করা হয় তাহা হইলে উহা আর ইছলাম থাকিবে না।" প্রকৃত কথা এই যে, ইছলামকে আধুনিকীকরণের প্রশ্নই সম্পূর্ণ অবান্তর। ইছলাম সার্বকালীন দৈনন্দিন জীবনের ধর্ম, সর্ব যুগের মানব জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে উহার শিক্ষা প্রসারমান। দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষার অপপ্রভাবে ইংরাজী শিক্ষিত দলের একটি প্রভাবশালী মহলে ইছলামকে মানব জীবনের বেগমান গতিপথ হইতে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক একটি বস্তুরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই মনোবৃত্তির ফলেই ধর্মীয় শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা হইতে সম্বন্ধ-চ্যুত একটি পৃথক বিষয়রূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই জন্যই আধুনিক ইংরাজী শিক্ষা সম্পূর্ণ রূপে অনৈছলামিক।

আধুনিক বিজ্ঞানের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাও উপরোল্লিখিত আপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিজ্ঞান খৃষ্টীয় ধর্মের অবদান নয়—উহা ইছলামের আলোকোজ্জ্বল যুগের গৌরবময় উত্তরাধিকার। মুছলিম বৈজ্ঞানিকরাই সর্বপ্রথম যুক্তি তর্কের আরোহ প্রণালী প্রয়োগ ও ব্যাখা করেন। বস্তুত এই প্রণালীর সূত্র কোরআন মজিদেই সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। পবিত্র কোরআনে পুনঃ পুনঃ মুছলমানদিগকে মননশীলতায় উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে এবং আল্লাহ মানুষকে যে চিন্তাশক্তি এনায়ত করিয়াছেন তাহার—সদ্ব্যবহারের জন্য তাকীদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, ইছলামে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইছলামের গৌরবময় যুগে জ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান সাধনাকে ধর্মীয় কর্তব্য রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল। তখন যেরূপ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের অস্তিত্ব ছিল না আজও তেমনি নাই। অতীত যুগের অনুসৃত শিক্ষানীতির সহিত বর্তমান শিক্ষার যোগসূত্র পুনঃ স্থাপিত করাই আজিকার সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। *

* মরহুম ডক্টর খলিফা শুজাউদ্দীন এম, এ, এল, এল, ডি, এর Muslim Education in Indo-Pak Sub-continent প্রবন্ধ অবলম্বনে,—Vide Al-Islam, November, 1954.

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সমস্যা

—অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী
এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সমস্যা শিরোনামা দেখে পাঠকবৃন্দের কতকটা আঁতকে উঠা অস্বাভাবিক নয়। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী মাত্রেই বহু সমস্যার সংগে পরিচিত। অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, ভাষা-সমস্যা প্রভৃতি থেকে শুরু করে কৃষি-সমস্যা, পাট-সমস্যা, বাণিজ্য-সমস্যা, বন্যা-সমস্যা, বাসস্থান-সমস্যা, বেকার-সমস্যা, এমনি আরো কতো শত সমস্যার সংগে এদেশের সাধারণ মানুষের পরিচয়। সুতরাং বহু সমস্যা-জর্জরিত পূর্ব পাকিস্তানীদের কাছে 'সাহিত্য-সমস্যা নামক এক নতুন সমস্যার কথা উপস্থিত করাই মুস্কিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্য-সমস্যা যে রয়েছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য যে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরে উঠ্‌ছে না, এতো অত্যন্ত জানা কথা। সুতরাং এর অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক নিশ্চয়ই রয়েছে। আজ সে সমস্ত অন্ধ প্রতিবন্ধক সমূহের অনুসন্ধান ও তার প্রতিবিধানের দিকে মনোযোগী হবার সময় এসেছে। নইলে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে যাবে। পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের অগ্রগতির পথে যে সমস্ত অন্তরায় রয়েছে, আমি সেগুলোকেই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সমস্যা বুঝাতে চাচ্ছি।

সাহিত্যের আদর্শগত দ্বন্দ্ব

ভারতীয় মুসলিম-সমাজের স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকেই পাকিস্তানের জন্ম। পূর্ব পাকিস্তানও বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও বংগীয়-মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্যবোধেরই ফল। ভাষাগত ও ভৌগোলিক বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান যে একরাষ্ট্র গড়ে তুলতে পেরেছে, সে শুধু ভারতীয় মুসলিমদের সমচৈতন্য ও সমধর্মিতার পরিণতি। পূর্ব-পাকিস্তানে এই নতুন ভৌগোলিক সংস্থার নিজস্ব সাহিত্যরচনা করার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। কিন্তু এই সাহিত্যরচনা করার ক্ষেত্রে যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, তাকেই আমি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানতম সাহিত্য সমস্যা বলে মনে করি।

জাতীয়-সাহিত্য বনাম বিশ্ব-সাহিত্য

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষা বাংলা। বৃটিশ আমলে বাংলাভাষী এক বৃহত্তর ভূখণ্ডের অংশ ছিলো এই পূর্ব-পাকিস্তান। কিন্তু ক্রমশঃ পূর্ব-পাকিস্তান ভূখণ্ডের অতীত ঐতিহ্য এবং বর্তমানের নবলব্ধ আদর্শিক চেতনা মিলে একে অখণ্ড বাংলাভাষী মুল্লুক থেকে পৃথক করেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব সাহিত্যরচনা করতে হলে এর অতীত ঐতিহ্য যে বাংলাভাষী অপরাঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র এবং এর বর্তমান আদর্শগত ভিত্তি যে হিন্দু-বাংলা খণ্ড থেকে আলাদা সেটা স্বীকার করে নিতে হয়। নইলে সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের রং লাগ্‌তে পারেনা। সাহিত্যে জাতীয় আদর্শগত স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, বিশ্বের সকল জাতির সাহিত্যের অন্তর্নিহিত আদর্শ তো একই, কেননা সাহিত্য বিশ্বজনীন। সুতরাং সাহিত্যে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রয়েজনীয়তা কি? এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আমরা বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বজনীনতা অস্বীকার করিনা। কিন্তু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নিজস্ব চিন্তাধারা, ধ্যানধারণা, ধর্ম-সাধনা, মনন-মানস ও জীবন-প্রণালীর স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে রচিত সাহিত্য কি বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বজনীনতার পরিপন্থী? দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির শিক্ষা, রুচি-সংস্কার, ধর্ম ও মননগত যে পার্থক্য রয়েছে, তা যদি তাদের সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত না হয় তাহলে সাহিত্য সমাজ-জীবনের আলেখ্য কোন্ অর্থে? সাহিত্যিক যে সমাজ ও পরিমণ্ডলের মানুষ, সেই সমাজ ও পরিবেশের ছাপ তাঁর রচিত সাহিত্যে থাক্‌তে বাধ্য। তা যদি না থাকে, তাহলে বাস্তব সাহিত্য রচিত হতে পারেনা। সে ক্ষেত্রে সাহিত্যকার যে জীবনকে অংকিত করবেন, সে-জীবন হবে এক বায়বীয় পরিমণ্ডলের ধোঁয়াটে জীবন। এর মানুষেরা সামাজিক রক্তমাংসের দেহী মানুষ না হয়ে, হবে একেকটা অশরীরী প্রেতচ্ছায়া

মাত্র। কোন এক বিশেষ সমাজ-ভুক্ত সাহিত্যিক যদি বিশ্বজনীন চরিত্র অংকন করবার মানস-বিলাসে নিজের সমাজের পরিচিত মানুষকে অংকিত না করে একটা পোষাকী বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধি দাঁড় করায় তাহলে সেই মূর্তিটি বাস্তর মানব না হয়ে, হবে কাল্পনিক জগতের "মমি" বিশেষ। প্রতিভাশালী সাহিত্যিক তার নিজের সমাজের চরিত্রকে তার "নিজস্ব স্বরূপে" অংকিত করেই তাকে বিশ্ব-মানবতার প্রতীক করে তুলতে পারেন। গোর্কীর 'মা' তাই বিশ্বজনীন মাতৃত্বের দাবী করতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' এ জন্যেই বিশ্বজনীন পিতৃত্বের প্রতীক হতে পেরেছে। সুতরাং বিশেষকে নির্বিশেষ, ব্যক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক-রূপে অংকিত করার জন্যে চাই সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা। কাজেই একথা বলা ঠিক হবেনা যে, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে রচিত সাহিত্য বিশ্বজনীনতার পরিপন্থী। বিশ্ব সাহিত্যকে যদি আমরা বলি একটা বিচিত্র ফুল তাহলে বিভিন্ন দেশীয় বা জাতীয় সাহিত্যকে বলবো তার পাঁপড়ি। একটা ফুলের বিভিন্ন পাঁপড়ি বিভিন্ন বর্ণের হলে তাতে ফুলের সৌন্দর্যসুষমা বৃদ্ধিই পায়। পাঁপড়ির বর্ণ-বৈচিত্র্য যেমন ফুলের সৌন্দর্য-সুষমার বিরোধী নয়, তেমনি বিভিন্ন দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পরিপন্থী নয়।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য

পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যে যে প্রাণবন্যা আসছে না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, পূর্বপাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের পথে সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনায় হস্তক্ষেপ করছেন না। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ এই ভৌগোলিক সংস্থার অধিকাংশ মানুষ ইছলামী ভাবাপন্ন। ইছলাম এদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এরাও ইসলামী জীবনকেই ফিরে পেতে চায়। এই ইসলামী চেতনাই পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের প্রধানতম ভিত্তি এই ইসলামী চেতনা থেকেই পূর্ব-পাকিস্তান পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ। তাই পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের মূল উৎস হবে পাকিস্তানী নব-জাতীয়তার আদর্শিক অনুপ্রেরণা। দ্বিতীয়তঃ ভাষার উত্তরাধিকারের দিক থেকেও ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব-পাকিস্তানীরাই "বাংলা ভাষার" প্রকৃত দাবীদার। আরবী পারসীশব্দ বহুল জনগণের জবানী ভাষা 'গৌড়ীয় বাংলাই' প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশীয় হিন্দু মুসলমানের মিলিত বাংলা ভাষা। ভারতচন্দ্র প্রমুখদের রচনাই তার প্রমাণ। সংস্কৃত পণ্ডিতরা এ ভাষাকেও যবন ভাষা বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আসলে ফোর্ড উইলিয়ম কলেজীয় বৃটিশ পোষ্য ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিতদের কারসাজিতেই 'সংস্কৃত বাংলা' জন্মপরিগ্রহ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, বংকিমচন্দ্র প্রবর্তিত সংস্কৃত বাংলাকে "রাঢ়-ভাষ" বলতে হবে। এই ভাষাভাষী যে অচঞ্চল হিন্দু-বাংলা তা পূর্বকাল থেকেই 'রাঢ়' নামে খ্যাত। পূর্ব-পাকিস্তানের ভূমিই প্রকৃত 'বাংলা ভূমি'। এই বাংলা ভূমি প্রাচীন হিন্দ ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত কখনো ছিলো না। রাঢ়রা এদেশীয়দেরকে 'বাংগাল' বলে গালি দেয় আজো। রাঢ় দেশীয় পণ্ডিতবৃন্দ কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বজনস্বীকৃত ভাষাকে 'মুসলমানী বাংলা' বলে অপাংক্তেয় করবার ষড়যন্ত্র পূর্ব পাকিস্তানীরা ভুলতে পারে না। সুতরাং হিন্দু মুসলিম লেখকদের রচিত বিপুল পুঁথি সাহিত্য পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্যিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। অতএব ভাষা এবং ভৌগোলিক বিচারেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য বিরোধী সাহিত্যিক দল

এই স্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে প্রাণবন্ত করে তোলার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব পাকিস্তানের—সাহিত্যকর্মীদের মধ্যে অনেকেই এই স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেন না। 'অখণ্ড বাংলা' ও কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য আজো এদের হৃদয়ে বিপুল প্রেরণা যোগায়। এদের এক দল শান্তিনিকেতনী শাশ্বত বংগের স্বপ্নে বিভোর। আর এক দল রুশীয় তথা-কথিত সাম্যবাদের জয়গানে মাতোয়ারা। এদেরই তৃতীয় দল ফ্রয়েডীয় যৌন বিকারের ধ্বজাধারী। প্রথমোক্ত দল সাহিত্যক্ষেত্রে রোমান্টিসিজমের—মৌতাতে বুঁদ হয়ে রয়েছেন, দ্বিতীয় দল পূর্ব পাকি-স্তানের বাস্তব জীবনে শ্রেণী সংঘর্ষ খুঁজে না পেয়ে মহাশূন্যে "হাতুড়ি-শাবল" ছুঁড়ছেন। ফ্রয়েডের মুরিদ

তৃতীয় দলটি সুযোগ বুঝে রোমাণ্টিক প্রেমলীলার "উদয়নের" নামে প্রবৃত্তির আরতি করেন, কিংবা সুবিধা বুঝে 'অগত্যা' সাম্যবাদের নামে 'যুগের দাবী' ঘোষণা করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে গণ মানুষের পরিচয় এদের সাহিত্যে থাকতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানের—তৌহিদবাদী জনতার প্রাণধর্মের পরিচয়লেশহীন যে সাহিত্য এরা রচনা করছেন, কালধর্মের অমোঘ-নিয়মে তা বিলীন হতে বাধ্য। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে এরা পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য পরিবেশকে ঘোলাটে, কোন্দলমুখী ও পূতিগন্ধময় করে তুলছেন। আদর্শবাদী সাহিত্য পরিবেশকে এরা বিধ্বস্ত করছেন। আরো মুস্কিল হচ্ছে এই যে নিজেদের—কাল্পনিক জনপ্রিয়তার প্রচার করবার বিস্তর কৌশল এদের নখদর্পণে। এদের বন্ধুবান্ধব অনেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন সাময়িক ও দৈনিক সংবাদপত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। তাদের সহযোগিতায় আত্ম-গোষ্ঠির প্রচারণায় এরা ওস্তাদ। উপরন্তু সাহিত্য লিখে যতটা না হোক, 'সাহিত্য-সংসদ' গড়ে এবং 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন' করে এরাই যে পূর্ব-পাকিস্তানের সেরা লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী তা জাহির করতে ছাড়েন না। কলকাতার সংগে এদের নাড়ীর যোগ অবিচ্ছেদ্য, তাই কলকাতার সাহিত্যিকদের 'দাওয়াৎ' করে এনে তাদের 'নসিহৎ' শোনার প্রবণতা যেমন তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তেমনি নিজের লেখা কলকাতার দু একটা পত্রিকায় ছাপা হলে এরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠেন। কলকাতার 'দাদা'দের একটুখানি প্রশংসা পেলে এরা অভিভূত হয়ে পড়েন। এই হীনমানসিকতার স্পষ্ট পরিচয় হচ্ছে পূর্ব বাংলার "সমকালীন সেরা গল্প" নামক একখানি সংকলন। এতে বহু অখ্যাতনামা অর্বাচীন লেখককে গ্রহণ করা হয়েছে শুধু মাত্র দলীয় দৃষ্টিভংগি থেকেই। কলকাতা থেকে এর ছাপানোর ব্যবস্থা করার পেছনে কলকাতার সার্টিফিকেটের লোভ ছাড়া আর কি থাকতে পারে?

পূর্ব-পাকিস্তানে আদর্শবাদী লেখক গোষ্ঠী

পাঠক পাঠিকারা হয়ত ভাবছেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের আদর্শবাদী লেখকগোষ্ঠী কি নেই? রয়েছে নিশ্চয়ই। এও স্বীকার্য্য যে পূর্ব-পাকিস্তানের সত্যিকার সাহিত্য কিছুটা এরাই সৃষ্টি করছেন। পাকিস্তানের মূল আদর্শের ভিত্তিতে মননশীল আদর্শমূলক সাহিত্য গড়ে তোলবার দিক থেকে প্রবীণদের মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী প্রমুখ আলেমদের দান সর্বাগ্রে স্বীকার্য। মননশীল সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়ে অধ্যাপক আবুল কাসেম, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক হাসান জামান, জনাব আবুল হাশিম, মীর শামসুল হুদা, শামসুল হক, মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, মওলানা আবদুর রহিম, মোহাম্মদ আবদুর রহমান, আবদুল গফুর, হাসান ইকবাল প্রমুখদের অবদান স্বীকার করতে হয়। প্রথমোক্ত আলেমদের বৈশিষ্ট্য এই যে তারা ইছলামের চিরন্তন রূপটি ইছলামী ব্যবহার শাস্ত্রের আলোকে তুলে ধরেছেন এবং প্রয়োজন স্থলে উক্তির সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করেছেন। শেষোক্ত শ্রেণীর লেখকরা দুনিয়ার অধুনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ইছলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে মূলতই যুক্তিমুখী হয়েছেন। এঁরা প্রধানতঃ ইংরাজী শিক্ষিত। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই এদের রচনার প্রভাব স্বভাবতঃ ক্রিয়াশীল।

মননশীল সাহিত্যের বিবিধ প্রবন্ধ ও সাহিত্য সমালোচনায় পুরাতন দলে ডাঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডাঃ এনামুল হক, মরহুম আবদুল করিম, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মরহুম ওয়াজেদ আলী, অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খান, গোলাম মোস্তফা, সামসুন্নাহার মাহমুদা প্রমুখ মনস্বী এবং নতুন দলে সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক আবদুল হাই, নাজিরুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আশরাফ, অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন, আবদুল মওদুদ, অধ্যাপক আবদুল লতিফ চৌধুরী, অধ্যাপক আবুতালিব, আবদুল জব্বার, আকবর আলী, অধ্যাপিকা হালিমা খাতুন প্রভৃতি লেখক লেখিকাদের নমোল্লেখ করতে হয়।

আদর্শ-মানব

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ; বি, টি।

আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু ইচ্ছা করিলে উর্ধজগত হইতে স্বর্গীয় দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যস্থতায় মানুষের জন্য তাঁহার মঙ্গল নির্দেশ, প্রদান করিতে ও মুক্তির সুনির্দ্দিষ্ট উপায় বাৎলাইতে পারিতেন, কিন্তু সে পথে অগ্রসর না হইয়া তিনি মানবরূপী রছুল ও নবীদিগকে প্রেরণ করিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সংসার-বিরাগী, গৃহত্যাগী অথবা ক্ষুৎপিপাসা ও যৌনবোধশূন্য ভোগ-নিরাসক্ত এক মহামানবকে মানুষের চূড়ান্ত হেদায়তের জন্য প্রেরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি দুনিয়ার পূর্ণ পরিণত অবস্থায়, মানব সভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ের সূচনায় এমন মানুষকে তাঁহার পয়গাম-বাহী, দিকদিশারী ও আদর্শ মানবরূপে জগতের বুকে অবতীর্ণ করিলেন যিনি স্বভাবে প্রকৃতিতে, খেলাধূলায়, আহার-বিহারে, ব্যবসায় বাণিজ্যে, স্নেহ মমতায়, প্রেম-প্রণয়ে, সাধারণ ও স্বাভাবিক

(২৩১ পৃষ্ঠার পর)

সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্যে পুরানো দলে রয়েছেন গোলাম মোস্তফা, মরহুম শাহাদৎ হোসেন, জসিমুদ্দিন, আবুল হাশেম, আবদুল কাদির, কাদের নেওয়াজ, মইনুদ্দিন, কাজী আকবর হোসেন, বন্দে আলী, সুফিয়া কামাল প্রভৃতি। পাকিস্তানী জাতীয় সংগীত ও 'পাকিস্তানী কবিতা' রচনায় গোলাম মোস্তফা ও শাহাদৎ হোসেন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কাজী আকরম হোসেনের কৃতিত্ব মূলতঃ অনুবাদে। জসিমুদ্দিন ও বন্দে আলী 'নক্সীকাঁথার মাঠ' ও 'ময়নামতীর চর' পরিভ্রমণ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের পল্লীজীবনের কাব্য-রূপ দিয়ে এঁরা জাতির ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যক্ষেত্রে বলিষ্ঠ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন নতুন শিল্পীদল। ইসলামী রেনেসাঁর পথে দৃপ্তপদক্ষেপে এগিয়ে এসেছেন কবি ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, বেনজীর আহমদ, সৈয়দ আবদুল মান্নান, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, মোফাখখারুল ইসলাম, মতিউল ইসলাম, মোযহারুল ইসলাম, রওশন ইজদানী, আবদুল হাই মাশরেকী, মফিজুদ্দিন আহমদ, বজলুর রশীদ, শেখ সাইফুল্লাহ প্রভৃতি। কাব্যক্ষেত্রে এঁরা 'প্রতিভা'র পরিচয় দিতে পেরেছেন একথা দৃঢ়কণ্ঠেই ঘোষণা করা যায়। এই দলের অসংখ্য তরুণ কবিদের মধ্যে আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, মাহফুজুল্লাহ, চৌধুরী লুৎফুর রহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, লতিফা রশীদ, জাহানারা আরজু, নুরুন্নাহার, প্রমুখদের মধ্যে বিপুল প্রতিশ্রুতির পরিচয় আমরা পাচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কাব্যের এই সব শিল্পীরা যদি হাততালির মোহে কিংবা বাইরের প্ররোচনায় লক্ষ্যচ্যুত না হন তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই—একথা দৃঢ়তার সংগেই বলা যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য-বিশ্বাসী কথা সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের মধ্যে পুরানো দলে মাহবুবুল-আলম, ইব্রাহিম খান, আকবর আলী, আবুরুশ্‌দ, নুরুল মোমেন, আবুল ফজল, আবুল কালাম সামসুদ্দিন, মতিনউদ্দিন আহমদ, মোতাহার হোসেন প্রভৃতি এবং নতুন দলে শাহেদ আলী, আসকার ইবনে শাইখ, সানাউল্লাহ নূরী, আবুজাফর সামসুদ্দিন, মীর্জা আবদুল হাই, মোজাম্মেল সিদ্দিক, আতায়োর রহমান, মিন্নত আলী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখরা রয়েছেন।

—আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

মানুষেরই সুন্দরতম শ্রেষ্ঠতম প্রতীক।

প্রাকৃতিক নিয়মেই তিনি মাতৃগর্ভে স্থানলাভ করিলেন, স্বাভাবিক উপায়েই ভূমিষ্ঠ হইলেন, প্রচলিত পদ্ধতিতে ধাত্রীমায়ের বিম্বাধর চুষিয়া তাঁহারই কোলে কাঁখে মানুষ হইলেন। শৈশবে খেলাধূলার স্বাভাবিক বৃত্তি, হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনার সহজাত দোলায় হিল্লোলিত আন্দোলিত হইলেন, বাল্যে স্বাভাবিক ভাবেই মাঠে ময়দানে মরু উদ্যানে মেষ চড়াইলেন, পরিণত বয়সে ব্যবসায় বাণিজ্যের সাহায্যে অর্থোপার্জনে মনোনিবেশ করিলেন, যৌবনে জীবন সঙ্গিনীর প্রয়োজনীয়তা সাধারণ ভাবেই অনুভব করিয়া গৃহ সংসার পাতিয়া বসিলেন, দাম্পত্য প্রেম ও অপত্য স্নেহের স্নিগ্ধ মধুর পরশে পারিবারিক জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। পাড়া প্রতিবেশীকে ভালবাসিলেন, সমাজের দীন দীন দরিদ্র অভাব পীড়িত রুগ্ন দুঃস্থদের দ্বারে গিয়া অর্থ দিয়া, সেবা করিয়া সাহস ও বল সঞ্চার করিয়া তাহাদের অন্তরের মণিকোঠায় এক দরদ-মধুর স্থান প্রস্তুত করিয়া লইলেন, দেশের কলহরত দ্বন্দ্ব-বিভক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে প্রেম ও ভালবাসার পুণ্যপরশে মিলন ও ঐক্যের সূত্র রচনা করিলেন।

কিন্তু মানবীয় বৃত্তি, জৈব ধর্ম ও প্রাকৃতিক নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া ও প্রচলিত সংস্কার এবং সামাজিক পরিবেশে মানুষ হইয়াও তিনি ছিলেন সমাজের অন্যান্য মানব হইতে স্বতন্ত্র। বিশ্বাস ও আকিদায়, আচরণ ও ব্যবহারে, চালচলন ও কার্যকলাপে তিনি নিজেকে স্বীয় সমাজ ও দেশের সঙ্গে একাত্ম করিয়া তুলিতে পারেন নাই। যে পুষ্পের সুগন্ধি ও সৌরভ উত্তর কালে উহার গন্ধ মাধুর্যে, সুরভি লালিত্যে ও সৌন্দর্য সুষমায় দিগদিগন্ত আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার পবিত্র হৃদয়-অভ্যন্তরে উহারই অবিকশিত কুঁড়ি—তাঁহাকে কলুষ কালিমা হইতে—অন্যায় কাজ ও গর্হিত আচরণ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল; উহারই স্ফুটনোন্মুখ কলি অপ্রকাশের রুদ্ধ আবেগে—বিকাশ লাভের তীব্রপ্রেরণায় তাঁহাকে মানুষের কলকোলাহল, স্বার্থদুষ্ট, হিংসাদগ্ধ জগতের অশান্ত পরিবেশ হইতে নির্জন নিস্তব্ধ হেরাগুহার শান্তপূত পরিবেশে টানিয়া লইয়া যাইত। মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এবং তাহাদের মনের গহনকোণে যে আমানিশার গাঢ় আঁধার নামিয়া আসিয়াছিল, তাহার চির অবসানের জন্য আল্লাহর রহমতের এক ক্ষুদ্র জ্যোতির্কণা তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে আবৃত রাখা হইয়াছিল। উহারই অপ্রদীপ্ত তেজের দ্যোতনা তাঁহাকে সমাজের নৈতিক অধঃপতন, আত্মিক অবচেতনা, শের্ক ও কুফরীর মহাপাতক এবং কলহ বিবাদ, মারামারি, হানাহানি ও রক্তারক্তির বিষাক্ত পরিবেশ পরিবর্তনের উপায় আবিষ্কারের চিন্তায় মশগুল করিয়া তুলিল। উদার উন্মুক্ত মরু-ইলাকা, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারকা আর বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির লীলা-বৈচিত্রের মূলকেন্দ্র সর্ব-শক্তির মূলাধার সদাজাগ্রত, চিরজীবন্ত মহাজ্যোতি-র্ময় স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহাপ্রভুর ধ্যানসাধনায় তন্ময় তদ্গত হইয়া—তাঁহার সাহায্য ও পথ নির্দেশের প্রত্যাশায় তিনি দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি অধীর প্রতীক্ষায় সময় কাটাইতে লাগিলেন।

তাঁহার দীর্ঘ সাধনা যে পুণ্যমুহূর্তে সিদ্ধিলাভ করিল, আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের চিরসমাপ্তি ঘটাইয়া—ধ্যাননিরত মহামানবের চিত্তফলকে যে শুভক্ষণে দৈবজ্যোতির প্রথম ঝলক বিচ্ছুরিত হইল তখন তাঁহার মানবচিত্ত ক্ষণিকের জন্য কম্পিত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, ঐশী আলোর বিদ্যুচ্ছটা তাঁহার নর-নয়নকে ঝলসিত করিয়া দিল। ভীত-বিহ্বল সাধক মোহাম্মদ (দঃ) জিব্রাইলের বক্ষালিঙ্গনে ও অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হইলেন, তাঁহার উচ্চারিত কালামে-ইলাহী পাঠ করিয়া ও হৃদয়ফলকে গ্রথিত করিয়া কম্পিত বক্ষে স্পন্দিত হৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন, জীবনসঙ্গিনী শান্তি-দায়িনী খোদেজা বিবিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঢাক আমায় ঢাক— কাপড় দিয়া ঢাক।"

রক্ত মাংশের মানব সন্তান, প্রাকৃতিক নিয়ম ও জৈবক্ষুধার নিয়ম নিগড়ে আবদ্ধ মাটির মানুষ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভীতি, প্রেম-প্রণয় শোক-দুঃখে আবেগ-চঞ্চল আদম-পুত্র স্বর্গীয় জ্যোতির পুণ্যপরশ লাভ

করিলেন, উর্ধাকাশ হইতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া মানবের জন্য আলোকদিশারী ও জ্বলন্তবর্তিকা সাজিলেন—আল্লাহর মনোনিত রছুল নির্বাচিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার রেছালত তাহার মানবত্বকে ঘুচাইয়া দিল না। মানুষের সর্বোত্তম প্রতিনিধি বিশ্ব-মানবতার মুক্তিপথ-প্রদর্শক নিয়োজিত হইলেন। তিনি পরবর্তী কালে বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে মানুষের অবগতি ও হুশিয়ারির জন্য ঘোষণা করিলেন—

انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد -

নিশ্চয় আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার নিকট এই প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে যে, তোমাদের উপাস্য-প্রভু একক আল্লাহ।

রেছালতের মধ্যস্থতায় আছমানী আলোর ধারা আঁধার দুনিয়ায় নামিয়া আসিল, স্বর্গলোকের পীযুষ ধারা তৃষিত তাপিত দুনিয়া ও উষর মরুভূমিকে জীবনরসে সিঞ্চিত করার কাজে লাগিয়া গেল। মৃত পাইল প্রাণ, দুর্বল হইল সবল, কঠিন হইল নরম। পতিত মানবতা পশুত্বের স্তর হইতে সত্যকার মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নীত হইল, হৃদয়ের পুঞ্জীভূত কলুষ-কালিমা ও অজ্ঞানতার তামসিকতা দূরীভূত হইয়া বিশোধিত অন্তরে পুণ্যের জ্যোতি ও জ্ঞানের দীপশলাকা স্নিগ্ধ ভাতি বিকীরণ করিতে লাগিল। মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উৎপাটিত হইয়া সাম্যের মোহনছবি ফুটিয়া উঠিল, শের্ক ও কুফরী, ব্যভিচার ও মাদকতা অভ্যাস, নীতিহীনতা ও অন্ধসংস্কার, শোষণ ও নির্যাতন, শিশু-হত্যা ও নররক্তের হোলিখেলা বন্ধ হইয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তওহীদের ভিত্তিতে, ন্যায়নিষ্ঠা ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদে শান্তি ও কল্যাণের মাধুর্যমণ্ডিত পরিবেশ সৃষ্টি হইল। মৃতকল্প দিশাহারা জাতি এক অকল্পিত জীবন কাঠির পরশে চেতনা-জাগ্রত ও জীবন্ত জাতিতে রূপান্তরিত হইয়া মুক্তির বাণী ও কল্যাণের পয়গাম দিকে দিকে দিশে দিশে আকুল আগ্রহে দৃপ্ত উৎসাহে ছড়াইতে লাগিল। বিশ্বের পতিত মানবতা মনুষ্যত্বের উচ্চতম মর্যাদার স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইল!

কেমন করিয়া এই অসম্ভব সম্ভব হইল? যাঁহার পুণ্যসংস্পর্শে, দীক্ষা ও শিক্ষায় বর্বরতার সর্বশেষ প্রান্তে উপনীত, জাহেলিয়তের জমাট আঁধারে সমাচ্ছন্ন জাতি সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত, জ্ঞানের বিমল ধারায় স্নাত হইয়া উঠিল তাঁহার হস্তে পূর্ববর্তী নবী ও রছুলদের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতা বা মো'জেজার ভাণ্ড ছিল এবং উহার পরিচয়ে আরববাসী বিস্ময়ে চমকিত এবং মুগ্ধও হইয়াছিল এবং এই সব অলৌকিক ঘটনার ভিত্তিতে তিনি মানবাতীত অতীন্দ্রীয় ক্ষমতার দাবী করিলে তাঁহার ভক্ত অনুচরবৃন্দ বিনা দ্বিধায় তাহা বিশ্বাসও করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, বরং তিনি ভবিষ্যতের খবর অবগত আছেন বীর গাঁথায় উল্লিখিত এমন ইঙ্গিতের প্রতিবাদ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। কোরআনের ভাষায় তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, –

لا املك لنفسى نفعا ولاضرا الا ماشاء الله - لوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير - وما مسنى السوء - ان انا الانزير وبشير لقوم يومنون -

"আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা ব্যতীত কোন কল্যাণ অথবা ক্ষতির উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নাই। গায়বের খবর অবগত থাকিলে পুণ্যকাজ আমি অনেক বেশী করিতাম, এবং কোন অন্যায় আমাকে স্পর্শ করিতে পারিতনা। আমি কেবল একজন হুশিয়ারকারী এবং তাহাদের জন্য শুভ-সংবাদদাতা যাহারা বিশ্বাসী।" রছুলুল্লাহ (দঃ) যে একজন মানুষ ছিলেন এবং মানুষের নিয়ম নিগড়ে আবদ্ধ ও ত্রুটীবিচ্যুতির অধীন ছিলেন একথা কোরআন এবং হাদীছে বহু স্থানে বিঘোষিত হইয়াছে। তিনি সুস্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ, যখন তোমাদিগকে তোমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোন নির্দেশ প্রদান করি, তখন উহা প্রতিপালন করিও, আর যখন নিজের রায় হইতে—(পার্থিব ব্যাপারে) কোন কথা বলি, তখন স্মরণ

রাখিও যে আমি একজন মানুষ মাত্র।"

তাঁহার জীবনের পবিত্রব্রত উদযাপনের পথে বাধা আসিয়াছে বিস্তর, কিন্তু কোন বাধাই তাঁহাকে মুহূর্তের জন্য দমিত করিতে পারে নাই, তাঁহাকে প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত করার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম লোভনীয় ও আকর্ষণীয় জিনিস প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে কিন্তু তিনি সমস্তই তুচ্ছ মনে করিয়া হেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বিপদের উপর বিপদ দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছে তিনি অদম্য সাহসে, অনমনীয় দৃঢ়তায় সমস্ত বাধাবিপত্তিকে পায়ে ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়াছেন এবং অতি অল্প সময়ে এমন বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, দুনিয়ার ইতিহাসে যাহার নযির দুর্লভ—যাহা মানুষের ভাবনার উর্ধে, কল্পনার অতীত। কিন্তু এই সুমহান কৃতকার্যতালাভে তিনি মানবের সাধ্যাতীত কোন পন্থা অথবা অতীন্দ্রীয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। নিষ্ঠুর ও নির্দয় অত্যাচারীর মস্তকের উপর পাথরের পাহাড় নিক্ষেপের জন্য পাহাড়ের ফেরেশতা তাঁহার অনুমতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সম্মতি দিতে পারেন নাই। মানবীয় চেষ্টায় তাঁহাদের মনের পরিবর্তন সাধনের আশা পরিত্যাগ করেন নাই। অবশ্য আল্লাহর সাহায্য ও মদদ তিনি সর্বদাই আকুল ভাবে কামনা করিয়াছেন কিন্তু সে সাহায্যযাচ্ঞা অলস, অক্ষম ও কর্মবিমুখের যাচ্ঞা নয়। মুছলমানকে বিপদে আপদে, যুদ্ধে জেহাদে, রুজি রোজগারে, ব্যবসায় বাণিজ্যে—সর্ব অবস্থায় সর্ব ব্যবস্থায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য ও মদদ চাহিতে হইবে—এই বাস্তব শিক্ষাই তিনি দিয়া গিয়াছেন।

অলস ও অক্ষমের সাধনাশূন্য মনস্কামনা আল্লাহ কোনদিন মনযুর করেন না। আকাঙ্খায় সিদ্ধিলাভের জন্য আল্লাহর সাহায্য এবং তজ্জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন যেমন একান্ত কাম্য তেমনি উহার জন্য সাধনা ও তপস্যা, প্রস্তুতি ও সুসজ্জাও অপরিহার্য। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার উম্মতের জন্য এই আদর্শই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মুছা (আঃ) তাঁহার বিস্ময়কর মোজেজার সাহায্যে নির্যাতিত বনি ইছরাইলদিগকে ফেরাউনী যুলুমের অক্টোপাশ হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। কিন্তু বনি ইছরাইল মোজেজার কল্যাণে বিপদের আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়ার সৎসাহস অর্জন করিতে পারে না, ঈছা (আঃ) অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের সাহায্যে তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে চমকিত করিয়া তোলেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে বিশ্বাসের অবিচল দৃঢ়তা ও অতল গভীরতা সৃষ্টি করিতে পারেন না। মানবতার পূর্ণ পরিণত আদর্শ, বাস্তবতার মূর্তিমান প্রতীক ছারওয়ারে কায়েনাত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মদীনা রক্ষার জন্য অলৌকিক ব্যবস্থা, অতীন্দ্রীয় আয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন না, তিনি তাঁহার ঈমান-বল-দৃপ্ত জেহাদী ফৌজ বাহিনীকে যুদ্ধের সম্ভাব্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেন, যুদ্ধের প্রচলিত কলাকৌশল অনুসারে রক্ষাব্যূহ রচনা করেন, পরিখা খনন করেন। তাঁহার দ্বীনের সংরক্ষণে, আদর্শের প্রচার ও প্রসারকার্যে তাঁহার ফেদায়ে-দ্বীন ছাহাবায়ে কেরাম বিপদের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িতে, শূলে চরিতে, যুদ্ধের বিভীষণ লীলাক্ষেত্রে লাফাইয়া পড়িয়া কলেজার তাজা রক্ত ঢালিতে ক্ষণিকের জন্যও দ্বিধা ও কুণ্ঠা বোধ করেন না।

সংসারের কারা-প্রাচীর হইতে মুক্তিলাভ এবং জীবনের সিদ্ধি অর্জনের জন্য মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) বুদ্ধের ন্যায় স্ত্রীপুত্র পরিবার ও গৃহ সংসার পরিত্যাগের আদর্শ তুলিয়া ধরেন নাই, মোক্ষলাভের জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারদের ন্যায় শেষজীবনে বনবাসের বিধান প্রদান করেন নাই, যিশুখ্রীষ্টের ন্যায় চিরকুমারত্ব বরণের অবাস্তব পথ প্রদর্শন করেন নাই, বরং মানব সভ্যতার ক্রমবিকশিত ধারায় গড়িয়া উঠা মানুষের আবাসভূমি—গৃহাঙ্গণে স্ত্রীপুত্র পরিবারসহ সুখসমৃদ্ধ-জীবন উপভোগের সহজাত বাসনাকে দলিত মথিত না করিয়া তিনি উহারই ভিতর নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দুনিয়ার বিচিত্র স্বাদ-গন্ধ-মাধুর্য উপভোগের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করার পথ বাৎলাইয়া পরপারের অমর ও অনন্ত জীবন-লাভের

ঈদে-মীলাদুননবী

ডক্টর মোহাম্মদ আবদুলবারী
এম, এ-ডি, ফিল (অক্সন)

প্রতিবারের মত এবারেও বেশ শান শওকতের সাথে পাকিস্তানের সর্বত্র ঈদে-মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপিত হোল। নজরুল দিবস, ইকবাল দিবস বা রবীন্দ্র জয়ন্তীর মত বারই রবিউল-আউয়ালও যেন শুধু একটি 'দিবসেই' পর্য্যবসিত হ'তে চলেছে। নজরুল দিবসে আমরা যেমন নজরুলের জীবনী, কবিতা, রচনা বা গান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, সভাসমিতি ও জল্‌সা করে থাকি, নবী দিবসেও আমরা তেমনি বক্তৃতা ও মিলাদখানীর করি ইন্‌তিজাম এবং আর আর 'দিবসের' মত এ দিনটিও শেষ হয়ে যায় প্রাণহীন অনুষ্ঠান শেষের ক্লান্তিতে। নবী দিবসের সার্থকতা শুধু কি সভা সমিতিতে?

মহানবী মুহাম্মাদ (দঃ) কে আমরা দু'ভাবে গ্রহণ করেছি। একদল তাঁর জীবনের বিভিন্ন বাস্তব-অবাস্তব এবং ঐতিহাসিক কাল্পনিক কেচ্ছাকাহিনী ও অলৌকিক ঘটনাবলী ভক্তিগদগদচিত্তে আউড়ে মনে করি যে আমরা তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করছি। আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যাই যে, নবী (দঃ) স্বয়ং এমনি অন্ধভক্তির প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কোরআন তাঁর সম্বন্ধে

(২৩৫ পৃষ্ঠার পর)

নির্ভুল সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

শুধু সন্ধানই নয়, নিজের জীবনের বিভিন্নস্তরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও শত সহস্র দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়া, দাম্পত্য জীবনের ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রশাসনের মৌলিক নীতির অনুপম আদর্শ উপস্থিত সময় এবং অনাগতকালের উম্মতে-মুছলিমার জন্য তুলিয়া ধরিয়াছেন। ধর্মনেতা ও সমাজ সংস্কারক, শাসক ও রাজনৈতিক নেতা, সৈন্য ও সেনানী, অত্যাচারিত ও বিজয়ী বীর, আইন-প্রণেতা ও বিচারক, পিতা ও স্বামী, শিক্ষক ও ইমাম, সেবক ও প্রভু, ব্যবসায়ী ও শিল্পী প্রভৃতি জীবনের যে কোন শাখার ও যে কোন স্তরের মানুষের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। তাঁহার বৈচিত্র্য-মণ্ডিত জীবনে প্রত্যেকের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রহিয়াছে। তিনি মুখে যাহা বলিয়াছেন, কার্যে তাহাই পরিণত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, অপরকে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, নিজে পূর্বেই তাহা পালন করিয়াছেন। অভাবের সময়ে যে নীতিকথা প্রচার করিয়াছেন, প্রাচুর্যের সময়ে তাহা ভুলিয়া যান নাই। দুর্বল ও অসহায় মুহূর্তে তাঁহার পবিত্র যবান হইতে যে আদর্শ-বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া তাহা হইতে মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হন নাই। যখন অর্থহীন ও সম্বলহীন তখন তিনি বলিয়াছেন, পার্থিব ধন ও স্বর্ণ মাণিক্যে তাঁহার লোভ নাই, যখন ঐশ্বর্যের পসরা তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে তখন উহা অকাতরে বিলাইয়া দিয়া নিজে তাঁহার চিরকাম্য দারিদ্র্য এবং সরল ও সহজ জীবনকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন। যখন নিজে দুর্বল, দুঃস্থ, উৎপীড়িত ও নির্যাতিত তখন ঘোষণা করিয়াছেন, অত্যাচারীকে মার্জ্জনা কর, দুশমনকে ক্ষমা কর। যখন তাহার নিষ্ঠুরতম অত্যাচারী, আজীবন দুশমন পরাজিত পর্যুদস্ত ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রতিশোধ গ্রহণের অপূর্ব্ব সুযোগ হাতে পাইয়া এবং সেই সুযোগকে কার্যে পরিণত করার মত শক্তি রাখিয়াও বিনাদ্বিধায় তিনি অতীতের জঘন্য আচরণ ও তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা দেল হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে বিনাশর্তে মার্জনা করিয়াছেন। কথা ও কার্যের এমন সুসঙ্গতি, প্রতি কার্যে ও আচরণে মহত্ত্বের এমন সুন্দরতম বাস্তব দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি সর্বদেশের সর্বকালের ও সর্ব বর্ণের মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠতম, সুন্দরতম আদর্শ।

ঘোষণা করছে,

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد -

"বল, হে মুহাম্মদ (দঃ)—আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র; (আমার বৈশিষ্ট্য) আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, তোমাদের উপাস্য একক ও একমাত্র।" (আল্‌কাহ্‌ফ, শেষ আয়ত) কবি বুসিরী এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দু'টি অনবদ্য ছত্রে,

فمبلغ العلم فيه انه بشر * وانه خير خلق الله كلهم

"অতএব তাঁর (নবীজীর) সম্বন্ধে মোট কথা হচ্ছে যে তিনি মানুষ এবং তিনি আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেরা।" অথচ আমরা মানুষ নবী, পিতা নবী, গৃহী নবী, চিন্তানায়ক, জননায়ক, রাষ্ট্রনায়ক ও সমরনায়ক নবী (দঃ) কে ভুলে মনের পাতায় সর্বদা আঁকছি এক কল্পনার নবী যাঁকে দূর থেকে আমরা সালামই জানাতে পারি কিন্তু পারিনা অনুসরণ করতে বা আমাদের জীবনাদর্শ বলে গ্রহণ করতে। অতীতের অনেক জাতি নবীদের স্বাভাবিক ও সাধারণ জীবন যাপনে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে মন্তব্য করত,

مال هذا الرسول يأ كل الطعام و يمشى فى الاسواق -

"এ কেমন ধারা রসুল যে খাবার খায় এবং হাট-বাজারেও যায়!" (আল্ ফুরকান, ৮ম আয়ত) রসুলদের সম্বন্ধে এমনিধারা ভুল ধারণা থেকেই উত্তরকালে জন্ম নিয়েছিল নবী-চরিত্র-বিকৃতি যার শেষ পরিণতি আমরা দেখতে পাই ক্রুশ ও হজরত ঈসার পূজোতে। এ কথা কোন অবস্থাতেই ভুলা যেতে পারেনা যে নবীরা যদি মানুষ না হয়ে আর কিছু হ'তেন তবে নবুওতের কোন সার্থকতাই থাকতনা। নবীরা ধরাধামে নেমে এসেছেন اسوة حسنة বা সুন্দর আদর্শ হয়ে। তাঁরা স্বীয় দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কেমন করে সত্যিকারের মুসলিমের জীবন যাপন করতে হয় যাতে করে তাঁদের দেখে ও তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও সফলতা, সার্থকতা ও তারাক্কীর পথে জোর কদমে এগিয়ে যেতে পারি। Example is better than precept—উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত ভাল। তাইত যুগে যুগে দেশে দেশে অধঃপতিত ও নিষ্পেষিত মানবতার উদ্ধারকল্পে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের আলোকবর্তিকা হাতে এসেছেন দিশারী নবী।

আর একদল নবী (দঃ) কে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে নামিয়ে এনেছি। তাই তাঁর যে কোন আদেশ নিষেধ ইচ্ছামত গ্রহণ বা বর্জন করবার পূর্ণ অধিকারী বলে নিজেদের আমরা মনে করছি। মুহাম্মদ (দঃ) শুধু যে মানুষই ছিলেননা বরং মানবশ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন এ কথা বিস্মৃত হয়ে আমরা কোরআনের সে সতর্কবাণী ভুলে যাই যে,

وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم -

"যখন আল্লাহ এবং তাঁহার রসুল কোন বিষয়ে আদেশ করেন তখন বিশ্বাসীদের সে বিষয়ে পসন্দ (অপসন্দের কোন অধিকার) থাকিতে পারেনা।" (আল্-আহযাব, ৩৬ আয়ত)

এবং এ কারণেই ইসলাম বলতে আমরা বুঝি শুধু এর সামাজিক দিকটি। ইসলামের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক দিকটি আমাদের 'যুক্তিবাদী' দৃষ্টিতে হয়ে পড়ে অর্থহীন শূন্য আচার অনুষ্ঠান।

মা আয়েশাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নবী চরিত সম্পর্কে। তিনি সাথে সাথে জওয়াব দিয়েছিলেন যে নবী জীবনের সম্যক পরিচয় রয়েছে কোরআনে। নবী দিবস আমরা উদ্‌যাপন করে চলেছি খুব আড়ম্বরের সাথে কিন্তু নবী (দঃ) কে জানতে এবং চিনতে এবং কোরআন পড়তে, বুঝতে ও অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি আমরা ক' জন? কায়েদে আজমের প্রতি মৌখিক ভক্তি জানাতে আমরা তৎপর; তাঁর জন্ম দিবস পালন করতে আমরা উৎসাহী কিন্তু তাঁর উপদেশ মত unity, faith and discipline—একতা, বিশ্বাস ও শৃঙ্খলা—আমরা ক' জন রক্ষা করি, তেমনি জাঁকজমকের সাথে নবী দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আমরা শুধু এ সত্যকেই ঢেকে রাখতে চেষ্টা করি যে আমরা নবী জীবন ভুলে গিয়েছি।

নবী (দঃ) এর শিক্ষা গ্রহণ এবং তাঁর আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার মধ্য দিয়েই মাত্র আমরা তাঁর প্রতি যথার্থ ভক্তি প্রদর্শন

করতে পারি। এ জন্য প্রয়োজন ইসলামকে সম্যক রূপে উপলব্ধি করা। আমাদের দেশে অনেকেই আজকাল নিজ নিজ খেয়াল খুশীমত ইসলামের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন। পাকিস্তানী মাত্রই পাকিস্তান সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হবার 'অধিকারী' হলেও 'যোগ্য' হবেন না এ কথা যেমনি স্বীকার্য্য তেমনি এও অনস্বীকার্য্য যে ইসলাম ও কোরআন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার জন্মগত 'অধিকার' প্রতিটি মুসলমানের থাকলেও সে 'যোগ্যতা' তার নেই। 'যোগ্যতা' তাকে হাসিল করতে হ'বে। আইনের ব্যাপারে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার—সাহেবের দস্ত-আন্দাজী যেমন হাস্যকর হৃদরোগে উকিল সাহেবের নোসখা দেবার প্রয়াসও তেমনি বাতুলতার পরিচায়ক। ওদিকে ল'র ডিগ্রি থাকলেই কেউ রাতারাতি উকিল বনে যেতে পারে-না। প্রকৃত উকিল হ'তে হ'লে তাকে সাধনা করে আইনের বিভিন্ন ধারা ও দিক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করতে হ'বে এবং সাথে সাথে আইনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও রূপায়ন এবং সমাজের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও গতির সাথে তাকে হ'তে হ'বে সরাসরি পরিচিত। আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা যে সাধারণ অর্থে ইসলাম মাত্র একটি ধর্ম্ম নয়, ইসলাম একটি জীবন বিধান। মুসলমানের জীবনে ইসলামের প্রভাব তাই প্রত্যক্ষ, অন্তরঙ্গ ও সুনিবিড়। অধ্যাপক গীব সাহেব ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছেন,—

"Unlike the law which christendom inherited from Rome, therefore, Islamic Law takes into its purview relationships of all kinds, both toward God and toward men, including such things as the performance of religious duties and the giving of alms, as well as domestic, civil, economic and political institutions" অতএব রোম থেকে খৃষ্ট জগত যে আইন লাভ করেছিল, ইসলামী আইন তার পরিবর্ত্তে খোদা এবং মানুষ উভয়ের সাথে সব রকমের সম্পর্ক যথা, ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন, যাকাত প্রদান এবং সাথে সাথে পারিবারিক, নাগরিক, অর্থ—নৈতিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানাদিকেও স্বীয়গণ্ডির মধ্যে নিয়ে এসেছে।" আফসোস, আমাদের অনেকেই ইসলামের এই ব্যাখ্যার সাথে একমত নন। আর একমত নন বলেই তাঁদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়: সব চেয়ে সুন্দর জীবন ব্যবস্থা দুনয়াতে কোনটি? তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে বলতে পারেন না: ইসলাম। অথচ অনুরূপ প্রশ্নে যে কোন রুশ তৎক্ষণাৎই জবাব দিতেন: কম্যুনিজম। আমাদের রোগ এখানে। মুসলমান বলে দাবী করলেও ইসলামের প্রতি আমাদের দরদ কৃত্রিম। মুসলিম জগতের বর্ত্তমান দুর্গতির জন্য অনেকে ইসলামকে দায়ী করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মুসলিম জাহানের অধিবাসীদের ক'জন ইসলামের সত্য অনুসারী। আমাদের সমাজ-জীবনে দুর্নীতি, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি অনাচারের জন্য কি ইসলাম দায়ী? সেবার আদর্শ ত্যাগ করে—শোষণের নীতি গ্রহণ করতে মুসলিম জাহানের শাসক গোষ্ঠিকে কি ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে? দুর্ব্বল, দুস্থ ও এতীমদের ঘৃণা ও অবহেলা করার অনুপ্রেরণা কি ইসলাম দিয়ে থাকে? শিক্ষা, যুক্তি ও তর্কের পথ ছেড়ে অশিক্ষা, গোড়ামি ও অন্ধ তাকলীদের পূজারী হ'তে কি ইসলাম বলেছে? জাতীয় কর্ম্ম-বিমুখতা ও ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতার সবক কি ইসলাম পড়িয়েছে?

পাকিস্তানকে দুনয়ার বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বলে আমরা আত্মশ্লাঘা অনুভব করি কিন্তু বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যের প্রতি আমরা কতটুকু সজাগ? আজও কি প্রাণহীন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই আমরা নবীদিবসের কর্ত্তব্য শেষ করব না নবীজীর জীবন অনুধাবন করতে ও ইসলামকে স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করতে আমরা তৎপর হয়ে উঠব? নিজেরা মুসলিম হয়ে ও ইসলামী মতে জীবন নিয়ন্ত্রিত করেই আমরা বড়ত্বের বড়াই করতে পারি। Chartiy begins at home.

বিশ্ব-পরিক্রমা

ছুলতান ছউদের ভারত ভ্রমণ

বিগত ২৬শে নভেম্বর ছউদী আরবের ছুলতান ছউদ ১৭ দিন ব্যাপী সরকারী ছফরের উদ্দেশ্যে দুই শতাধিক লোকজন ও সঙ্গীসাথী সহ ভারতে তশরিফ আনয়ন করেন। ভারত ও ছউদী আরবের মধ্যে পুরাতন বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতার সম্পর্ক দৃঢ় করাই নাকি এই ছফরের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

অন্যান্য রাজা বাদশাহ এবং রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে ছউদী আরবের ছুলতানের একটি বড় পার্থক্য এই যে, তিনি ইছলামের আদর্শ ও নীতি বিসর্জন দিয়া আধুনিক দুনিয়ায় প্রচলিত রাষ্ট্রীয় নীতি এবং গতানুগতিক নিয়মকানুন অনুসরণ করেন না। তাঁহার সম্মানার্থে নাচ গান, ককটেইল পার্টি, ভোজসভায় মদ্যপান প্রভৃতি দূরের কথা তাঁহার উপস্থিতিতে ধূমপান পর্যন্ত না করার অনুরোধ জানান হয়। প্রচলিত প্রথায় ছুলতান রাজঘাটে গান্ধীর স্মৃতি মন্দির দর্শন ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করিতে যান নাই। পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল যে, তিনি ভারত অধিকৃত কাশ্মীর ভ্রমণেও যাইবেন, কিন্তু সম্ভবতঃ পাক-ছউদী-আরব বন্ধুত্বের কথা স্মরণ রাখিয়া এবং কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানী মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত ভারত অধিকৃত কাশ্মীর ভ্রমণেও যান নাই।

ছুলতান ছউদের ভারত ভ্রমণের রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী নয় বলিয়াই অনেকের ধারণা। ছউদী আরব সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এবং ভারত-ছউদীআরব বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি-বিধান সম্পর্কে আলাপ আলোচনা উক্ত ছফরের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ।

বাংলা একাডেমী

বিগত ৩রা ডিসেম্বর ঢাকার বর্ধমান হাউসে সরকারী ভাবে 'বাংলা একাডেমী'র উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধান এই একাডেমীর প্রধানতম উদ্দেশ্য। প্রধান মন্ত্রী আবু হুসেন সরকারের উদ্বোধনী বক্তৃতা এবং শিক্ষামন্ত্রী আশরাফুদ্দীন আহমদ চৌধুরীর—অভিভাষণে এই আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় সভ্যতা ও তমদ্দুনের সার্থক বাহন রূপে দুনিয়ার দরবারে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। বাংলা একাডেমীর প্রধান উদ্দেশ্য হইবে জাতীয় ঐতিহ্যের বাহন আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের অনুবাদ-প্রকাশ।

দুঃখের বিষয় উদ্বোধনী সভায় একপক্ষে মন্ত্রী, এম, এল, এ ও সরকারী কর্মচারীর আধিক্য ও মামুলি আমলাতান্ত্রিক পরিবেশ এবং আড়ম্বর পূর্ণ খানা পিনা, অন্যপক্ষে সাহিত্যিক, সংস্কৃতি-সেবী সাংবাদিক, ছাত্র এবং ইছলামী ভাবাপন্ন নেতৃবৃন্দের অনাহূতি এবং তাঁহাদের প্রতি ঔদাসীন্য বাংলা একাডেমীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আশান্বিত ব্যক্তিদিগকে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী মুছলিম লীগ

সাবেক আওয়ামী মুছলিম লীগের এক অংশ পূর্ব পাকিস্তান যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠন কালেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নূতন সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি আওয়ামী লীগ কর্তৃক যুক্ত নির্বাচন সমর্থন এবং অমুছলিমদের জন্যও প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত করার ফলে উহাতে নূতন করিয়া ভাংগন শুরু হইয়াছে। কতিপয় বিশিষ্ট নেতা প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন। আওয়ামী মুছলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বহু সংখ্যক এম, এল, এ, ১১ই নভেম্বরের সভায় যুক্ত নির্বাচন এবং 'মুছলিম' বর্জনের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ১৭ জন আওয়ামী লীগ এম, এল, এ, স্বাক্ষরিত মিঃ শহীদ ছোহরাওয়ার্দীর নিকট প্রেরিত এক স্মারক-লিপিতে বলা হইয়াছে যে, মুছলমানগণের পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুক্ত নির্বাচন মানিয়া লইলে জাতীয়তার কংগ্রেসী ব্যাখ্যা স্বীকার করা হইবে এবং

উহাতে পাকিস্তানের ভিত্তিমূল ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের মতে কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট সমর্থক যুব-লীগের অনুগত লোকদের প্রভাবেই মুছলিম জাতীয়তা বিরোধী উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে নাশকতা মূলক কাজে লিপ্ত পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন দুশমনগণ আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ করিবে। আওয়ামী **মুছলিম** লীগের টিকিটে এবং পৃথক নির্বাচনী প্রথায় নির্বাচিত এম, এল, এ, গণ **মুছলিম বর্জিত** ও যুক্ত নির্বাচনের সমর্থক আওয়ামী লীগের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন।

শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নহে, পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগেও ভাংগন শুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ১২ জন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, ইছলামী পদ্ধতিতে জীবন যাপন, ভৌগলিক, শ্রেণী ও ভাষাগত বৈষম্য দূরীকরণ, দেশের দুশমনদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও শ্রেণী-বিদ্বেষ রোধ প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনের কার্যসূচীকেই আওয়ামী মুছলিম লীগ উহার মেনিফেস্টো রূপে গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু বর্তমানে যুক্ত নির্বাচন ও অমুছলিমের প্রবেশাধিকারের স্বীকৃতি দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠান এই মৌলিক নীতি ও প্রধান উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ জাকোরী শরীফের পীর ছাহেবকে আহ্বায়ক করিয়া পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী মুছলিম লীগের সংগঠন কার্য শুরু হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তানের জন্যও একজন—আহ্বায়ক নির্বাচিত হইবেন এবং উভয় প্রতিষ্ঠান মিলিত ভাবে নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে আওয়ামী মুছলিম লীগের লাহোর মেনিফেস্টো অনুসারে কার্য শুরু করিয়া দিবেন। পৃথক নির্বাচনের সমর্থন এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কার্যসূচী রূপে গৃহীত—হইয়াছে। আগামী ৬, ৭ ও ৮ই জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুছলিম লীগের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে।

পুলিস ধর্মঘট

নভেম্বরের শেষের দিকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পুলিসের এক অংশ এবং মফঃস্বলের দুই একটি জায়গায় কয়েকজন পুলিস তাহাদের কতিপয় দাবী অপরিপূরণের ওজুহাতে কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া বসে। সরকারের দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করিতে পারে নাই। ধর্মঘটী পুলিসদিগকে সঙ্গে সঙ্গে রাজারবাগ ব্যারাকে আটক রাখা হয় এবং পরে তাহাদিগকে জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আনছার ও স্পেশাল পুলিস অফিসারগণ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিসের কাজ চালাইয়া যান। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত পুলিসের এই মারাত্মক ধর্মঘট পাকিস্তানে এই প্রথম। প্রকাশ দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি প্রয়াসী আভ্যন্তরীন দুশমনদের প্ররোচনায় এই নাশকতামূলক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সরকার কম্যুনিস্ট এবং অন্যান্য কতিপয় রাজনৈতিক দলের সহিত সংযুক্ত ব্যক্তি ও নেতাকে গ্রেফতার করেন। বিশেষ অনুসন্ধানের পর ইহাদের কয়েকজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ধর্মঘটের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি এবং ধর্মঘটী পুলিসদের বিচারের জন্য একজন স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োজিত হইয়াছেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন

২৯শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং সুফারিশ পেশের জন্য পূর্বপাক সরকার একটি উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন প্রকরণ—মিডল ইংলিস স্কুল, জুনিয়ার হাইস্কুল, জুনিয়ার ও সিনিয়র মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসা ও হাইস্কুলের অবস্থা ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা, রাষ্ট্রীয়, আদর্শের ভিত্তিতে পাঠ্য তালিকার পরিবর্তন, ধর্মীয় শিক্ষা, পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান

ও জনমত সংগ্রহপূর্বক তাঁহাদের ছুফারিশ সহ রিপোর্ট দাখিল করিবেন। শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং পাঠ্য তালিকার পরিবর্তন পাকিস্তানের বহুবিধ অসমাধ্য সমস্যার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। গতানুগতিক পথে সন্ধানকার্য পরিচালিত এবং রিপোর্ট উপস্থাপিত না হইয়া ত্রুটিমুক্ত সন্ধানকার্য পরিচালিত এবং জাতীয় আশা আকাঙ্খা অনুযায়ী প্রকৃত কাজ হইতে দেখিলেই জনগণ সন্তুষ্ট হইবে।

বাগ্‌দাদচুক্তি সম্মেলন

২১ ও ২২শে নভেম্বর বাগ্‌দাদে পঞ্চজাতি বাগ্‌দাদ চুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বৃটেন, তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ এবং পাকিস্তান উহার সদস্য। ইরাক ভিন্ন আরবলীগের অন্য কোন সদস্য দেশ উহাতে যোগদান করে নাই। মার্কিণের দুই জন প্রতিনিধি সম্মেলনে পর্যবেক্ষকরূপে যোগদান করেন। যুক্তরাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানে সরাসরি যোগদান না করিয়া উহার সহিত সামরিক ও রাজনৈতিক সংযোগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করে। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন।

উত্তর দিক হইতে সম্ভাব্য কম্যুনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাই নাকি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ এবং ইতিমধ্যে এই কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। প্রকাশ বিশ্বব্যাপী যে অ-কম্যুনিস্ট নিরাপত্তা ফ্রন্ট গড়িয়া উঠিয়াছে, উহার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া বাগ্‌দাদ চুক্তি প্রতিষ্ঠান হিমালয় হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ ও পাকিস্তানকে একই জোটের মধ্যে আনিয়াছে।

বাগ্‌দাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির নিরাপত্তার জন্য সম্মেলনে একটি সামরিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি রচিত হয়। নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণকে লইয়া একটি অর্থনৈতিক কমিটী এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ ও কারিগরি সাহায্য ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য স্থায়ী সামরিক ও রাজনৈতিক কমিটীও গঠিত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তে সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী সকল সদস্যই সন্তোষপ্রকাশ করেন।

যুক্ত-রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অফিসারগণের মতে ইহার ফলে যে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ইলাকার সৃষ্টি হইল—পাশ্চাত্য শক্তির পক্ষে তাহাই বড় লাভ। বৃটিশ মহলের মতে ইহাদ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার নূতন পথ প্রশস্ত হইল। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্মেলনে প্রধান দুইটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে—সম্ভাব্য কম্যুনিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধ এবং ফেলিস্তিন সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা। কিন্তু আরবলীগের অন্তরভুক্ত প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রই এই চুক্তির বাহিরে রহিয়াছেন। সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী ফেলিস্তিন সমস্যাকে উক্ত সম্মেলনের অধিকার বহির্ভূত বিষয় বলিয়া উল্লেখ করেন। বাগ্‌দাদ চুক্তিতে ইরাণের যোগদানকে সোভিয়েট বিপজ্জনক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নেহেরু হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার ক্ষুদে সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ বাগ্‌দাদ সম্মেলনের প্রসঙ্গে পাকিস্তানকে খোঁচা দিতেছেন।

আরব রাষ্ট্রসমূহে প্রতিক্রিয়া

ইরাক ভিন্ন আরব লীগের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি এই সম্মেলনকে মোটেই সুনজরে দেখিতে পারে নাই। তাহারা মনে করে ফেলিস্তিন সমস্যার জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গই দায়ী। এই সমস্যার বীজ নিক্ষেপ করে তাহারা, উহা জিয়াইয়াও রাখিতেছে তাহারাই। তাহারা বিশ্বাস করে ১৯৪৮ সাল হইতে আরব রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়া দুর্বল করিয়া রাখিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ইছরাইলকে প্রভূত পরিমাণে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়াছে, ইংরাজ এবং মার্কিণ উভয়েই গোপনে গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সামরিক সাহায্য প্রদান করিয়াছে। ১৯৪৮ সালে ইছরাইলকে পরাজিত করার ব্যর্থতার জন্য মূলতঃ পাশ্চাত্য কারসাজিই দায়ী।

পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাব এখন আরব জাহানে অত্যন্ত প্রবল। এই মনোভাবের জন্যই

জর্দান সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ২০ কোটি ডলার মার্কিণ সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। এই জন্যই তুরস্ক-ইরাক চুক্তি এবং উহাতে ইরাণের অন্তরভুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় অথচ মিসর কর্তৃক কম্যুনিষ্ট অস্ত্রক্রয়ে কোথাও কোন আপত্তির রব শোনা যায় নাই।

'ইছরাইল'কে অধিকতর অস্ত্রদানের আবেদন ব্রিটিশ সরকার বিবেচনা করিতেছেন। মিসর কর্তৃক কম্যুনিস্ট অস্ত্রক্রয়ে অসন্তুষ্ট আমেরিকার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা 'ইছরাইল'কে অস্ত্র সাহায্য দানের ছুফারিশ করিয়াছেন এবং প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার 'ইছরাইল'কে "ন্যায় সঙ্গত" দেশ রক্ষার জন্য 'প্রয়োজনীয়' অস্ত্র সরবরাহর কথা বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অপর পক্ষে মিসর-'ইছরাইল' সীমান্তে উত্তেজনা হ্রাসের জন্য জাতিসঙ্ঘের যুদ্ধ বিরতির পর্যবেক্ষক আবেদন জানাইয়াছেন। ইহার উত্তরে কায়রো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে, "জাতিসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ও আবেদনের উপর মিসরের আস্থা নাই। মিসর এখন দেশ রক্ষার জন্য তার সৈন্যদের শৌর্যের উপরই ভরসা করিবে।"

ইছরাইলকে ইঙ্গ মার্কিণ অস্ত্রসরবরাহর বিরুদ্ধে মধ্য প্রাচ্যের সর্বত্র প্রবল উত্তেজনা বিদ্যমান। এই অবস্থায় বাগদাদ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির অবলম্বিত মধ্যপ্রাচ্য যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা বলা দুষ্কর।

ভারত-সোভিয়েট মিতালী

১৮ই নভেম্বর সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মিঃ বুলগেনীন ও রুশ কমুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ক্রুশেভকে দিল্লীতে ১২ মাইল দীর্ঘপথের উভয় পার্শ্বে দশ লক্ষাধিক লোক বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। এরূপ বিপুল জাঁকজমকপূর্ণ সম্বর্ধনার দৃশ্য ইতিপূর্বে কমই দেখা গিয়াছে। এক পালাম বিমান ঘাটিতেই ত্রিশ ঝুড়ি ফুল জড় করা হইয়াছিল। ফুলে ও মালায় পথঘাট সয়লাব হইয়া যায়। বোম্বাইতেও অনুরূপ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কলিকাতার জনসভায় নাকি ৩০ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। ভারতের আজাদী লাভের প্রথমদিনেও এত আনন্দ স্ফূর্তির অভিব্যক্তি দেখা যায় নাই—জাতির জনক গান্ধিজীর ভাগ্যেও এমন সম্বর্ধনা জোটে নাই। জনতা এবং রুশীয় ও ভারতীয় নেতাদের মুখে বার বার "রুশী হিন্দী ভাই ভাই" রব ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। মিঃ বুলগেনিন ও ক্রুশেভ বার বার বলিয়াছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত ও রাশিয়া একযোগে এক দেহ ও এক আত্মা হইয়া কাজ করিতেছে ও করিয়া যাইবে। এতদ্‌সত্ত্বেও বিশ্বের জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলির নিকট হইতে তাহাদের বড় বড় উন্নয়ন পরিকল্পনায় আর্থিক সাহায্য গ্রহণের অপরিহার্যতার তাকিদে পণ্ডিত নেহেরুকে ঘোষণা করিতে হইয়াছে, "ভারতের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র-জোটে যোগদান করার সম্ভাবনা নাই, ভারত কোন 'শিবিরে'ই যোগদান না করার মূলনীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে।" অথচ ২০শে নভেম্বরের এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ রাশিয়া ভারতকে ৮৫ কোটি ৭০ লক্ষ ডলারেরও অধিক অর্থনৈতিক সাহায্যদানের প্রস্তাব করিয়াছে। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য উক্ত অর্থ ব্যয়িত হইবে।

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ভারত ভ্রমণের পর বর্মা গিয়াছেন। তথা হইতে ফিরিয়া পুনঃ ভারত হইয়া তাহারা আফগানিস্তানে যাইবেন। কাবুল সরকারকে রাশিয়া পূর্ব হইতেই নানারূপ সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বাগদাদ চুক্তি সম্মেলন এবং আফগান সরকারের পাক-বিরোধী প্রচারণা ও তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সোভিয়েট প্রধানদের ভারত-আফগান ভ্রমণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ইছলামী শাসন-সংবিধান

সম্পর্কে

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের আধুনিক কর্মতৎপরতা

গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগে পূর্ব-পাক জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীছের সভাপতি ইছলামী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়া ৫ই জুলাই তারীখে পাক-গণপরিষদের সদস্যবৃন্দের খিদমতে বাংলা, উর্দু ও ইংরাজী ভাষায় 'আবেদনপত্র' পুস্তিকাকারে ও 'তর্জুমানের' মাধ্যমে প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৫ই জুলাই তারীখে পূর্বপাক জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীছের লোকাল অর্গানাইজিং কমিটি ও উহার কার্যকরী সংসদের এক যুক্ত সভায় কোরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সর্বদলীয় মুছলিম জনগণের এক বিরাট জলছায় উক্ত প্রস্তাব পুনরালোচিত এবং পাবনা তরকারী বাজারে সন্ধ্যায় সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। ইতিমধ্যে ইছলাম-বিরোধীদল পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের অবসান ঘটাইয়া ইছলামী শাসনতন্ত্র রহিত করার এবং শাসনসংবিধানে যুক্ত-নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত এবং পূর্বপাকিস্তানের পূর্ববাংলা নামকরণের ষড়যন্ত্র তুমুলভাবে আরম্ভ করিয়া দেওয়ায় পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সভাপতি উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ৩০শে অক্টোবর তারীখে পুনরায় এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতিটিও পুস্তিকাকারে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয় এবং ইহার কতকাংশ 'দৈনিক আজাদের' ৪ঠা নভেম্বর তারীখে প্রকাশলাভ করে।

পূর্বপাক নিযামে-ইছলাম পার্টির পক্ষ হইতে ঢাকায় সর্বদলীয় উলামা কনভেনশনে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রিত হওয়ায় পূর্বপাক জমঈয়তে-আহ্‌লে হাদীছের সভাপতি শারীরিক এবং দফতর সম্পর্কিত বহুরূপী অসুবিধা সত্বেও জমঈয়তের মুবাল্লিগে আমুমি মওলানা আবদুল হক হক্কানী এবং আরও কতিপয় সহচর সমভিব্যহারে ২রা নভেম্বর তারীখের দ্বিপ্রহর রাত্রে ঢাকা ষ্টেশনে অবতরণ করেন। নিযামে-ইছলাম পার্টির পক্ষ হইতে মওলানা মুছলেহুদ্দীন এবং শহরের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিশেষতঃ বংশাল আহ্‌লেহাদীছ জামাআতের নেতৃবৃন্দ সেই গভীর রাত্রে জমঈয়ত-প্রেসিডেন্টকে বিপুল ভাবে সম্বর্ধিত করেন। বংশালের বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট বংশাল জামেমছজিদেই সদলবলে আড্ডা গাড়িতে বাধ্য হন। প্রায় দুই সপ্তাহকাল ধরিয়া মওলানা শামছুল হক, মওলানা আরিফ, মওলবী মোহাম্মদ আকীল, জনাব মুতওয়াল্লী অবদুল্লাহ, জনাব ছরদার আনিছুর রহমান, ইমাম মওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেবান এবং বংশালের অন্যান্য বন্ধুবান্ধব যেরূপ অনুরাগ ও আগ্রহের সহিত জমঈয়ত-প্রেসিডেন্টের পরম সমাদরে মেহমানদারী করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক ভুলিয়া যাওয়ার কথা নয়। আল্লাহতাআলা আমাদের বংশালের ভ্রাতৃবৃন্দকে তাঁহাদের এই দ্বীনী মহব্বতের অফুরন্ত পুরস্কার দান করুন। ৩রা নভেম্বর হইতে বিভিন্ন দলের ও মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের যাতায়াত আরম্ভ হইয়া যায়। ঢাকায় যাঁহাদের সন্দর্শন ও সান্নিধ্যের সুযোগ এই ব্যাপারে জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জনাব মওলানা আতহার আলী, শর্ষিণার মাননীয় পীর মওলানা আবুজা'ফর, মওলানা আযীযুর রহমান, আল্লামা রাগিব আহছান, মওলানা মুছলেহুদ্দীন, মওলানা আশরাফ আলী, মওলানা আবদুল্লাহ নদভী, মওলানা কবীরুদ্দীন, ডক্টর ছানাউল্লাহ পি, এইচ, ডি (ব্যারিষ্টার), ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল বারী এম-এ, ডি, ফিল (অক্সন), বিচার বিভাগের মন্ত্রী জনাব নাছিরুদ্দীন, মওলানা আবদুল আযীয (তবলীগী জামাআত), শামছুল উলামা মওলানা বেলায়েত হুছয়ন ও মওলবী জমশেদ আলী ছাহেবান সমধিক উল্লেখ

যোগ্য।

সর্বদলীয় উলামা কনভেনশন রূপে আহূত হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ বিভিন্ন কারণে সমুদয় দলের ও মতের নেতৃস্থানীয় আলিমগণ এই কনভেনশনে যোগদান করেননাই, এমন কি যথাযথভাবে সকলে আমন্ত্রিতও হন নাই। নিযামে ইছলাম পার্টির সভাপতি জনাব মওলানা আতহার আলী ছাহেব এই ত্রুটির জন্য বিশেষভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং যাহাতে অন্ততঃ শহরের বিভিন্ন দলীয় উলামায়ে কিরাম কনভেনশনে যোগদান করেন তাহার সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রতিশ্রুত হন। ৪ঠা নভেম্বর শুক্রবার বেলা ৮টা হইতে পুরাতন ঢাকা কলেজ বিল্ডিঙ্গে কনভেশনের অধিবেশন শুরু হয়। যে কয়েক শত উলামা এই কনভেনশনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিযামে-ইছলাম পার্টির উলামায়ে কিরাম ব্যতীত জমঈয়তে আহলে হাদীছের স্থানীয় ও বহিরাগত আলিমবৃন্দ এবং স্থানীয় প্রবীণ আলিম ও বিখ্যাত রাজনীতি বিশারদ জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান ছাহেব উল্লেখযোগ্য। শিক্ষামন্ত্রী জনাব আশরাফুদ্দীন চৌধুরী ও বিচারসচিব জনাব নাছিরুদ্দিন খান ছাহেবও কনভেনশনে যোগদান করিয়াছিলেন। কনভেনশনের বিঘোষিত সভাপতি জনাব মওলানা আতহার আলী খান ছাহেব পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের সভাপতি জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী ছাহেব-কে কনভেনশনের সভাপতিত্ব করিতে অনুরোধ করেন, তাঁহার প্রস্তাব যথারীতির সমর্থিত হওয়ায় জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় মোটামুটিভাবে দুইটি প্রধান বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে যোর দেন। তিনি বলেন:—

"শুধু দল বিশেষকে পরাস্ত করার জন্য ইছলাম বিরোধী বিভিন্ন দলের সহিত গোঠ বাঁধিয়া আলিমগণ যে অমিশ্র যোগসাধনের অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন বর্তমান রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি তাহারই অনিবার্য পরিণতি মাত্র।" জনাব ফযলুল হক ছাহেব যুক্ত নির্বাচন বিরোধীদিগকে দুষ্কৃতিপরায়ণ বলিয়া যে গালিগালাজ করিয়াছেন, প্রেসিডেন্ট তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, "ইছলামের নামে উলামায়ে-কেরামকে প্রলুব্ধ করিয়াই জনাব হক ছাহেব তাঁহার নষ্ট আসন পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছেন। কোরআন মজিদ গলায় ঝুলাইয়া যে ইছলামের নামে তিনি ভোট ভিক্ষা করিয়াছিলেন সেই ইছলাম পন্থীদিগকে দুষ্কৃতিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত করা এবং ইছলামী শাসনতন্ত্রের বিরোধ করা সর্বাপেক্ষা জঘন্য দুষ্কৃতি।" প্রেসিডেন্ট ছাহেব জনাব শহীদ ছুহরাওয়ার্দী ছাহেবের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া কোরআনের বিভিন্ন আয়ত ও ছুন্নতের নির্দেশ উধৃত করিয়া বলেন যে, "মুছলিম ও কুফ্‌রের ভিন্ন ভিন্ন মিল্লতের তথা জাতীয়তার অন্তরভুক্ত হওয়া এরূপ সুপরিচিত ও সর্বজনবিদিত কথা যে, ইছলামী আকীদার প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদেরও তাহা অবিদিত নাই।" তিনি বলেন, "ইউরোপীয় জাতীয়তার সংজ্ঞা ইছলামী দৃষ্টিভংগীর সর্বতোভাবে পরিপন্থী। মুছলমানগণের জাতীয়তা ইছলামের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইছলাম ও কুফরকে একই জাতীয়তার অন্তরভুক্ত করিলে মুছলিম নামের অবলুপ্তি সাধন সর্ব প্রথম কর্তব্য হইবে। যাহারা এই অপবিত্র কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছে, মুছলমানগণের পক্ষে কোনক্রমেই তাহাদের দিকে আপোষের হস্ত প্রসারিত করা সম্ভবপর হইবেনা।" যে মওলানা পুংগব দ্বিজাতিতত্ত্বকে চতুষ্পদে পরিণত হওয়ার নামান্তর বলিয়া গলাবাযী করিয়াছেন, তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া সভাপতি ছাহেব বলেন যে, যে সকল অংগ প্রত্যংগ দেহের অন্তরভুক্ত নয় সেগুলিকে কৃত্রিম অস্ত্রোপচারের সাহায্যে দেহের অংগরূপে পরিণত করার অপচেষ্টা দেহের মৃত্যুরই নামান্তর। কুফ্‌র ইছলামী দেহের অংগ নয়। যাহারা জবরদস্তী উহাকে ইছলামী দেহের অন্তরভুক্ত করিতে সচেষ্ট হইতেছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইছলামের শত্রু ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

অতঃপর যে সকল নেতৃস্থানীয় উলামা কনভেনশনে

যোগদান করেননাই তাঁহাদের কনভেনশনে যোগ দেওয়াইবার সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য সভাপতি কনভেনশনের উদ্যোক্তাদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, "বর্তমানে রাজনীতি ক্ষেত্রে দুইটি মাত্র দল ব্যতীত তৃতীয় কোন দল নাই। একটি দল হইতেছে তাঁহাদের, যাঁহারা পাকিস্তানে ইছলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা কামনা করেন আর দ্বিতীয় দলটি হইতেছে তাঁহাদের, যাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকার আদর্শে বিভ্রান্ত হইয়া অথবা ইছলামবৈরীগণের চক্রান্তজালে পতিত হইয়া পাকিস্তান হইতে ইছলামকে নির্বাসিত করিতে চাহিতেছেন। সুতরাং যাঁহারা ইছলামপন্থী, তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক দল, মযহবী ফির্কাবন্দী এবং দলীয় সকল প্রকার স্বার্থ কোন্দল কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিয়া এক ও অখণ্ড ইছলামী ফ্রণ্টে সম্মিলিত হইতে হইবে এবং ইছলাম বিরোধীগণের সংগে জিহাদে অবতীর্ণ হইতে হইবে।"

কনভেনশনে যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে তাহার খসড়া প্রস্তুত করার জন্য সভাপতি সমভিব্যাহারে একটি সাব কমিটি গঠিত হয় এবং সভাপতির প্রস্তাব অনুসারে শর্ষিনার পীর ছাহেব ও মওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ ছাহেবকেও সাব কমিটির সদস্য তালিকার অন্তরভুক্ত করা হয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান ছাহেব এবং আরো কতিপয় বক্তার বক্তৃতার পর কনভেনশনের প্রাভাতিক অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

বৈকালিক অধিবেশনে যোগ দেওয়াইবার জন্য জমঈয়ত-প্রেসিডেণ্ট মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ছাহেব শর্ষিণার পীর জনাব মওলানা আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালিহ ও মওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ ছাহেবানের দ্বারস্থ হন এবং তাঁহাদিগকে কনভেনশনে যোগদান করিবার জন্য রাযী করেন এবং তাঁহাদের সমভিব্যাহারে সভাস্থলে উপস্থিত হন, ইহাতে কনভেনশনের গুরুত্ব বহুলাংশে বর্ধিত হয়। বৈকালিক অধিবেশনও বিশেষ সমারোহের সহিত সাফল্যমণ্ডিত হয়। সর্বদলীয় উলামা কনভেনশনে যে সকল প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল তন্মধ্যে কোরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রবর্তনের দাবী সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই প্রস্তাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয় যে, যদি বর্তমান গণপরিষদ কোরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে অন্য কোন ধরণের সংবিধান প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন, তাহাহইলে জাগ্রত জনগণ তাহা কিছুতেই বরদাশত করিবেনা। দ্বিতীয় প্রস্তাবে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিকে ইছলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং এই ব্যবস্থা দ্বারা ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অবিলুপ্তি এবং পাক-নাগরিকদের স্বার্থ ব্যাহত হইবার আশংকা প্রকাশ করা হয়। যুক্তনির্বাচন ব্যবস্থাকে পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা বহাল রাখিতে বলা হয়। অন্য আর একটি প্রস্তাবে পাকিস্তানের সংহতি এবং উভয় বাহুর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় পূর্ববাহুকে পূর্বপাকিস্তান নামে অভিহিত করার দাবী করা হয়। পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের সভাপতি ছাহেবের চেষ্টায় তাঁহার বিরচিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি বিশেষ উৎসাহ সহকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

"পূর্বপাকিস্তানের সকল ইছলামী, রাজনৈতিক তামাদ্দুনিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহাদের পারস্পরিক মযহবী ও দলগত সংকীর্ণতা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া পাকিস্তানে ইছলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পে তাহাদের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য এই সম্মেলন বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছে।"

"মুছলমানদের ধর্মীয় দলসমূহ যাহাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে তাহাদের মনোভাব বিষাক্ত করিয়া তুলিতে প্রয়াস না পায় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখার জন্য এই সম্মেলন উলামা সমাজকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।"

এই প্রস্তাবগুলি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক উত্থাপিত ও সমর্থিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল।

১১ই নভেম্বর শুক্রবার বংশাল এবং অন্যান্য মহল্লার আহ্‌লে-হাদীছ জুমা মছজিদ সমূহে শহরের অন্যান্য মছজিদ সমূহের ন্যায় ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবী করিয়া প্রস্তাবাবলী পরিগৃহীত হয়। বৈকালে নিযামে ইছলাম পার্টির উদ্যোগে পল্টন ময়দানে যে বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়, তাহাতেও

জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় অন্যূন ১৫ হাজার শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। সভাপতি এই সভাতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলসমূহকে জাতীয় স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হইয়া সকল মতভেদ পরিহার পূর্বক ইছলামী—শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি মিলিত ফ্রণ্টে সম্মিলিত হইবার উদাত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করেন। এই বিরাট জনসভাতেও পাকিস্তানে ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জনগণের মিলিত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়।

উলামা কনভেনশনে ইছলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে ইছলামী যুক্ত ফ্রণ্ট গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, উক্ত প্রস্তাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ১১ই নভেম্বর তারীখে পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ, পাবনা নিযামে-ইছলাম পার্টি, পাবনা সদর মহকুমা মুছলিম লীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে পাবনা শহরে ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করা হয় এবং অপরাহ্নে শান-শওকতের সহিত পাবনা তরকারী বাযারে একটি সর্বদলীয় মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভামঞ্চ হইতেও উলামা কনভেনশনের প্রস্তাবগুলি প্রতিধ্বনিত হয়।

১৪ই নভেম্বর তারীখে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীছের কার্যকরী সংসদ ও লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির যুক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমর্থন এবং যুক্ত নির্বাচনের প্রতিবাদকল্পে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংগে সংগে ইহাও বলা হয় যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আহলে-হাদীছগণ অন্য কোন রাষ্ট্রিক বা সামাজিক দল অপেক্ষা কম সমুস্যুক নহেন এবং এই উদ্দেশ্যে আবশ্যক মত ত্যাগ এবং কোরবানী প্রদান করার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ ও উৎসাহও কম নয় অথচ কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে পাক প্রধানমন্ত্রী যে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে আহলে হাদীছদিগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইয়াছে। ইহার জন্য পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের কার্যকরী সংসদ দুঃখিত হইয়াছেন এই সভায় আরো বলা হয় যে,—ঢাকার এক কুখ্যাত বাংলা দৈনিকে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের সভাপতি জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবকে "আজীবন কংগ্রেসী মওলানা" নিখিলবংগ ও আসাম উলামা সংগঠনের সভাপতি" এবং তাঁহাকে ও তাঁহার দলকে মুছলিমলীগের দুষ্কৃতির সমর্থক প্রভৃতি যে সব মিথ্যা ও অশোভন উক্তি করা হইয়াছে তাহার তীব্রপ্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, জনাব মওলানা ছাহেব প্রায় দুইযুগ পূর্বে কংগ্রেস ও উহার এক জাতীয়তার আদর্শের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এবং সক্রিয় রাজনীতির দুষিত আবহাওয়া হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া তবলিগী এবং সাহিত্যিক প্রচারণার মাধ্যমে ইছলামের খিদমত করিয়া চলিয়াছেন তিনি কল্পিত নিখিলবঙ্গ ও আসাম উলামা সংগঠনে নয়, দীর্ঘদিন হইতে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের সভাপতি পদে বরিত রহিয়াছেন। তিনি বা তাঁহার দল কস্মিনকালে মুছলিম লীগের অন্যায় কাজের সমর্থক সাজেননাই, বরং বক্তৃতা ও লেখনীর মারফত উহার ভ্রান্ত পলিসি ও কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এই সব সমালোচনা কোন ধ্বংসাত্মক মতলবে নয়, গঠনমূলক উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে।

ঢাকার বিভিন্ন সভা সমিতি ও তবলীগী কার্য শেষ করিয়া ১৩ই নভেম্বর তারীখে জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট নারায়ণগঞ্জের অন্তরগত পাঁচগাঁও, নওগাঁও প্রভৃতি ইলাকায় মুছলমানগণের দীর্ঘদিনের আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য সদলবলে যাত্রা করেন এবং ১৪ই নভেম্বর তারীখে তথায় স্থানীয় স্বনামধন্য পীর জনাব মওলানা আবদুর রায্যাক ছাহেবের সহিত রংপুর বাযার নামক স্থানে মিলিত হন এবং তাঁহার সহিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বহু গুরুতর বিষয়ের আলোচনা চলিতে থাকে। ১৫ই নভেম্বর তারীখে উক্ত বাযারে প্রায় ১০ হাজার লোকের সমবায়ে একটি ধর্মীয় জল্‌ছা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব পীরছাহেব, স্থানীয় গণ্যমান্য উলামা ও নেতৃবৃন্দ এবং ঢাকা ও ত্রিপুরা হইতে সমাগত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের মুবাল্লিগে আমুমী মওলানা আবদুল হক হক্কানী এবং পীরছাহেব জনাব মওলানা আবদুররয্যাক এই সভায় বক্তৃতা দান করেন। জমঈয়ত-প্রেসিডেণ্ট সভার সভাপতিরূপে তাঁহায় সুদীর্ঘ ভাষণে জাতির নৈতিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া সকলকে মিলিত ভাবে ইছলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে সভার কার্য শেষ হয়। এই সভায় প্রধানতঃ মওলবী রঈছুদ্দীন ছাহেবের উদ্যোগ আয়োজনের ফলেই জমঈয়ত প্রেসিডেণ্টের যোগদান করা সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিগণ যেরূপ বিপুলভাবে

জম্‌ঈয়তের কর্মীবৃন্দকে সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন এবং যেরূপ যত্নের হিত অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন তাহাতে জমঈয়তের খাদিমগণ সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়াছেন। ১৭ই নভেম্বর তারীখে পাঁচগাও অঞ্চল হইতে বিদায় হইয়া সন্ধ্যায় জম্‌ঈয়ত-প্রেসিডেন্ট সদলবলে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮ই তারীখে বংশালে জুমার নামায আদা' করেন। পূর্বপাক মুছলিমলীগ সভাপতি জনাব মওলবী তমীযুদ্দীন খান ছাহেবের আহ্বানে ২০শে নভেম্বর তারীখে তাঁহার বাসভবনে জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং দীর্ঘ তিন ঘণ্টাব্যাপী নানারূপ আলোচনা চলিতে থাকে। লীগ প্রেসিডেন্টকে জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট একটি র্বসদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট গঠন করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, বর্তমানের পারিপ্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক ভাবে ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কল্পে সচেষ্ট হইলে সাফল্য লাভ করা সহজসাধ্য হইবেনা। লীগের বর্তমান উর্ধতন নেতাদের নীতি বিচ্যুতি এবং ইছলাম বিরোধী কার্যকলাপের দরুণ অন্যান্য দলের নেতাদের ন্যায় তাঁহারাও জনগণের বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন। মুছলিম লীগকে শুদ্ধ করিয়া নূতন ভাবে সঞ্জীবিত করার সাধ্যসাধনায় যে সময় অতিবাহিত হইবে, তাহার পর পাকিস্তানের মূলনীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে সংগ্রাম করার অবসর থাকিবেনা। জনাব মওলবী তমীযুদ্দীন ছাহেব তদীয় আদর্শনিষ্ঠার জন্য এখনও জনগণের শ্রদ্ধাস্পদ রহিয়াছেন। বর্তমান সংকট মূহূর্তে জাতীয় সংহতির পুনরুদ্ধারকল্পে অবিমিশ্র ইছলামী আদর্শের অনুসারীদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকল্পে অগ্রসর হইলে আল্লাহর ফযলে সাফল্য লাভের বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। মওলবী ছাহেব জমঈয়ত প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবক্রমে আগামী বড়দিনের মধ্যে একটি সর্বদলীয় মুছলিম কনফারেন্স আহ্বান করার আশ্বাস প্রদান করেন।

২১শে নভেম্বর তারীখে জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট ঢাকা হইতে বিদায় হন। ষ্টেশন প্ল্যাটফরমে বহু বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

পাবনায় পৌঁছিয়া ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবীকে যোরদার করার উদ্দেশ্যে জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট তাঁহার সহকর্মী এবং বন্ধুবান্ধব সমভিব্যহারে ২৫শে নভেম্বর তারীখে পাবনা শহরের অন্তঃপাতী আঁটুয়া নামক মহল্লার এক মহতী জনসভায় সভাপতিত্ব করেন এবং ২৭শে নভেম্বর তারীখে তাঁহার চেষ্টায় পূর্বপাক জমঈয়তে-আহলে হাদীছ, সদর মহকুমা মুছলিম লীগ, যিলা জম্‌ঈয়তে উলামায়ে-ইছলাম এবং যিলা আঞ্জুমানে মুহাজেরীণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহের বিশিষ্ট সভ্যগণ পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীছের সদর দফতর সন্নিহিত জামে-মছজিদে সমবেত হন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্টের একটি অস্থায়ী অ্যাড-হক কমিটি গঠন করেন। জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীছের সেক্রেটারী মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি-এ, বি-টি, কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত হন। এই কমিটি পাকিস্তানে ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার দাবী যোরদার করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে অল্পদিনের মধ্যেই পাবনায় এক সর্বদলীয় ইছলামী কনফারেন্স আহ্বান করার আয়োজন করিবেন। ২রা ডিসেম্বর তারীখে পাবনা সদর মহকুমা মুছলিম লীগের উদ্যোগে স্থানীয় টাউনহলে একটি সর্বদলীয় বিরাট জলছার অধিবেশন হয়। এই মহতী সভাতেও জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করেন এবং মওলানা মুহীউল-ইছলাম, মওলানা হাছান আলী, মওলবী তোরাব আলী বি, এল, মওলবী আবদুররহমান, মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী, মিস্টার খোদাদাদ খান ছাহেবান ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়া উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন! এই সভাতেও সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট গঠন করার, ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠ করার, যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হইতে না দেওয়ার এবং পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্রের সর্বাধিনায়কের পদ মুছলমানের জন্য নির্ধারিত রাখার প্রস্তাবগুলি প্রায় চারি সহস্র জনতা বিপুল উৎসাহে ও মুহুর্মুহু তকবীর ধ্বনির ভিতর দিয়া সমর্থন করেন।

৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর তারীখদ্বয়ে কুষ্টিয়া যিলার অন্তর্গত কুমারখালী ও পাথরবাড়ীয়ায় পর্যায়ক্রমে দুইটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। জমঈতের মুবাল্লিগ মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী, মওলানা আবদুল হক হক্কানী, ডাক্তার আছীর ছিদ্দীকী, মওলবী আযীযুল ইছলাম, মওলবী কাযী আবদুল খালেক প্রভৃতি উভয় সভাতেই ইছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য এবং বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভাগুলিতেও জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ স্থানীয় মার্চেন্ট জনাব আবদুল কুদ্দুছ বিশ্বাস ও পাথরবাড়িয়া এবং দুর্গাপুরের আহলেহাদীছ জামাআতের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নের ফলেই এই সভাগুলি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভাষানীর চ্যালেঞ্জের জওয়াব

সংবাদপত্রে প্রকাশ, জনাব ভাষানী ৯ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রামের জনসভায় সমস্ত উলামায় কিরামের সম্মেলন আহ্বান করিয়া যুক্তনির্বাচন প্রথা ইছ্‌লাম বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য জনাব মওলানা আতহার আলী ছাহেবকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন।

আমি জনাব মওলানা আতহার আলী ছাহেবের পক্ষ হইতে ইছ্‌লামের নামে জনাব ভাষানীর এই চ্যালেঞ্জ স্বীকার করিয়া লইতেছি। সমস্ত উলামায়ে কিরামকে সম্মিলিত করার কোনই প্রয়োজন নাই। জনাব ভাষানী আগামী কল্য ১৩ই ডিসেম্বরের পর হইতে যে কোন দিবসে পাবনা অথবা রাজসাহী অথবা ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম শহরের যে কোন মছ্‌জিদ বা মাদ্‌রাছা প্রাংগণে যুক্ত নির্বাচন প্রথা যে ইছ্‌লাম বিরোধী, আমার নিকট হইতে তাহার কোরআনী ও হাদীছী প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু সংগে সংগে কাফের যে মুমিনের অভিভাবক ও প্রতিনিধি হইতে পারে, তাঁহাকেও ইহার প্রমাণ কোর্‌আন ও ছুন্নাহ হইতে প্রদর্শন করিতে হইবে। ইউরোপীয় গণতন্ত্র বা রুশীয় সমূহবাদের দলীল গ্রাহ্য হইবেনা।

সমগ্র উলামা সমাজকে সম্মিলিত করার প্রস্তাব প্রবঞ্চনামূলক, কারণ এরূপ সম্মেলনের ব্যবস্থা করা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য বটে এবং এরূপ একটি সাধারণ ও সর্বজনবিদিত বিষয়ের জন্য সমস্ত আলেম সমাজকে কষ্ট দেওয়া নিরর্থক। অবশ্য শরীঅতের প্রামাণিকতা-পদ্ধতি যাহা, জনাব ভাষানী যে তাহা প্রণিধান করিবার যোগ্যতা রাখেন তাহা প্রমাণিত করার জন্য যে স্থানে আমাকে আমার দাবী সাব্যস্ত করিতে হইবে, সেই স্থানের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র আরাবী প্রফেসর এবং আমার সম্মুখে জনাব ভাষানীকে যে কোন হাদীছ বা ফিক্‌হ শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থের (অনুবাদ নয়) অথবা আরাবী সাহিত্য গ্রন্থের তিনটি মাত্র পংক্তি বিশুদ্ধরূপে পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে। ওয়াছ্‌ছালামো আলা মানিত্‌ তাবাআল্‌ হুদা।

سنبھل کے رکھنا قدم دشت خار پر مجنوں'
کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہے !

ইছ্‌লাম-পন্থীদের খিদ্‌মতে

পাকিস্তানে বর্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে, তাহার ফলে ইহা চরমভাবে মীমাংসা করিয়া ফেলার সময় উপনীত হইয়াছে যে, পাকিস্তানে ইছ্‌লামের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে কিনা, আর যদি ইছ্‌লাম টিকিয়াও যায়, তাহাহইলে সে ইছ্‌লাম রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ইছলাম হইবে, না ইউরোপ ও আমেরিকার গণতন্ত্র অথবা সোভিয়েট রুশের সমূহবাদকেই ইছলামের নামে এই রাষ্ট্রে চালাইয়া দেওয়া হইবে? আমাদের একথার তাৎপর্য এইযে, পাকিস্তানে বর্তমানে ইছ্‌লামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে মাত্র দুইটি দল বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্যান্য দলগুলি যত নামেই অভিহিত হউন না কেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা ইছ্‌লাম ও ইছ্‌লামী আদর্শ সম্পর্কে উপরিউক্ত দুইটি দলের অন্তরভুক্ত যে কোন একটি দলের সংগেই সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। যাঁহারা ইছ্‌লামী আদর্শের প্রতি আস্থাশীল বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, অথচ কার্যতঃ ইছলাম-বিরোধী দলকে পরিপুষ্ট করা এবং ইছ্‌লামী জীবনাদর্শকে অবজ্ঞা ও উপহাস করার কার্যকে তাহাদের বিশিষ্ট আচরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ইছ্‌লাম-বিরোধী দলেরই অন্তরভুক্ত। যাঁহারা অনৈছলামিক শিক্ষা দীক্ষা ও নীতি নৈতিকতার কবলে পতিত হইয়া তাঁহাদের কুরুচি ও দুষ্ট দৃষ্টিভংগীর চরিতার্থতা সাধনকল্পে ইছলামের প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাসাধনে কোমর বাঁধিয়াছেন এবং যাঁহারা খোলাখুলি ভাবে ইছলামের শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত না হইলেও তাঁহাদের মনগড়া আদর্শ ও ধার করা জীবনব্যবস্থাকে ইছলামী জীবন ব্যবস্থারূপে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা উভয় দলই সমপর্যায়ভুক্ত। তাঁহারা সকলেই ইছলাম-বিরোধী শিবিরের সেনানী ও সৈনিক।

রছুলুল্লাহর (দঃ) মাধ্যমে আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক যে জীবন-ব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে তাহারই নাম ইছলামী জীবন-ব্যবস্থা। যাঁহারা হযরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) কে সত্যবাদী ও সত্যজীবী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইউরোপীয়, মার্কিনী, রুশীয় অথবা ভারতীয় জাতীয়তা, গণতান্ত্রিকতা ও সামাজিক ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, যাঁহারা বলিতেছেন, পাকিস্তানে কোরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রবর্তন সফল হইবার নয় তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে ইছলামের শত্রু ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। কিন্তু যাঁহারা ইউরোপীয় গণতন্ত্র ও সমাজ ব্যবস্থার গায়ে ইছলামের লেবেল আঁটিয়া পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপাইবার অপচেষ্টায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের ইছলাম-দুশ্মনী প্রথমোক্ত দল অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই কম নয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী ও কার্যক্রমের দিক দিয়া মুছলিম লীগ, 'মুছলিম' সহ ও 'মুছলিম' বর্জিত আওয়ামী লীগ, যুক্তফ্রন্ট, নেজামে ইছলাম পার্টি, কৃষক প্রজাপার্টি প্রভৃতি যতই বিভিন্ন দলে ও নামে বিভক্ত হউননা কেন, প্রত্যেকটি দলেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে ইছলামপন্থী ও বিরোধী উভয় দলের লোকই মওজুদ রহিয়াছেন। কম্যুনিস্ট ও ডেমোক্রাটদের উপরেও একথা তুল্যভাবে প্রযোজ্য, কারণ উভয় দলেই এরূপ বহু মুছলমান রহিয়াছেন যাঁহাদিগকে প্রবঞ্চনামূলক উপায়ে বুঝান হইয়াছে যে. ডেমোক্রেসী ও কম্যুনিজম ইছলামের বিপরীত বস্তু নয়।

বস্তুতঃ আজ পৃথিবীতে যে দুইটি জীবন-ব্যবস্থা ইউরোপীয় গণতন্ত্রবাদ ও রুশীয় সমূহবাদ নামে আখ্যাত, উহাদের প্রত্যেকটিই ইছলামী জীবনব্যবস্থার প্রতিকূল, ইছলামী জীবনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকল্পেই পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে। সুতরাং আজ পাকরাষ্ট্রে কোরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করিতে না পারিলে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইহার কোন মূল্যই অবশিষ্ট রহিবেনা। বর্তমানে পাকিস্তানের জাতীয়তা, ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্যশাসন বিধি, যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রভৃতির আন্দোলন যোরদার করিয়া তোলা হইতেছে, লক্ষ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মুছলিম লীগ হইতে আরম্ভ করিয়া কম্যুনিস্ট পার্টি পর্যন্ত সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ন্যূনাধিক ভাবে এইসকল ইছলামবিরোধী আন্দোলনে মওজুদ রহিয়াছেন এবং ইহারা নামের দিক দিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ইছলামের বিরুদ্ধাচরণ ব্যাপারে সকলেই একমত হইয়াছেন। জাতির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা এবং পাকিস্তান আন্দোলনের শত্রুদলের সহিত মিত্রতা রক্ষা করার ব্যাপারে ইহারা সকলেই সংঘবদ্ধ।

সুতরাং ইছলামী আদর্শকে নাস্তিকতার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে এবং পাকিস্তানকে পৃথিবীর বুকে টিকাইয়া রাখিতে হইলে রাজনৈতিক, তমদ্দুনী, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক, সমস্তদলের ইছলামপন্থীদিগকে অনতিবিলম্বে একটি ফ্রন্টে সমবেত হইতে হইবে।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের সভাপতি এই পন্থা অবলম্বন করার জন্যই নেযামে ইসলাম পার্টি ও পূর্বপাক মুছলিম লীগের সভাপতিকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহারা এই প্রস্তাবের সমীচীনতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহারাও মুছলমানদিগকে দল ও পার্টি নির্বিশেষে একটি ইছলামী ফ্রন্টে মিলিত হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন।

ইছলাম ও পাকিস্তানকে শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে, যাহারা হযরত মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) নেতৃত্বে আস্থাশীল, তাহাদিগকে শুধু এই উপায় অবলম্বন করিয়াই ইছলাম বিরোধী দলের সহিত সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب -

ত্রুটি স্বীকার

পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের সভাপতির বিভিন্নরূপ কর্মতৎপরতা নিবন্ধন তাঁহাকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত দফতর হইতে অনুপস্থিত থাকিতে হইয়াছে এবং তজ্জন্য **তর্জুমানুল হাদীছের** পঞ্চম সংখ্যা ঠিক সময়ে প্রকাশলাভ করিতে পারে নাই এবং সম্পাদনা ব্যাপারেও ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। আশাকরি সহৃদয় পাঠক ও গ্রাহকগণ কর্মীগণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমাদের এই ত্রুটি উপেক্ষা করিবেন।

রুশ নেতার ধৃষ্ট উক্তির বিরুদ্ধে জম্‌ঈয়ত-সভাপতির বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের সভাপতি জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব রুশ প্রধান-মন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারীর সাম্প্রতিক কাশ্মীর সম্পর্কীয় অশোভন উক্তির প্রতিবাদে সংবাদ পত্রে প্রকাশার্থে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন :—

'কাশ্মীর ভারতেরই অন্তরভুক্ত' বলিয়া রুশ প্রধান-মন্ত্রী মার্শাল বুলগেনিন এবং সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী নিকিতা ক্রুশেভ সম্প্রতি যে উক্তি করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও পরিতাপের বিষয় হইলেও উহাতে বিস্মৃত হইবার কিছুই নাই। কম্যুনিস্ট রাশিয়া সম্প্রতি ভারত এবং আফগানিস্তানকে উহার মিত্ররাষ্ট্ররূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং উহার নেতা পাকিস্তানকে অ-মিত্র রাষ্ট্র এবং পাক-ভারতের বিভক্তি ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের পরিণতিরূপে ঘোষণা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

রাশিয়া সম্মিলিত জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্র হইয়া এবং কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোটের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিয়া এখন ভারতের দালালরূপে উহার নেতৃদ্বয় কাশ্মীরীদের নিজস্ব ইচ্ছানুসারে ভারত বা পাকিস্তানের অন্তরভুক্তির প্রশ্ন বিবেচনার জন্মগত অধিকারকে পদদলিত করিয়া এবং পাকিস্তানের অস্তিত্বের মূলে আঘাত হানিয়া যে দম্ভোক্তি করিয়াছেন পাক সরকারের পক্ষে উহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত। পাক সরকারের উপর রুশ নেতাদের ধৃষ্টতা ও অশোভন উক্তির কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহা পাকিস্তানের মুছলিম জনবৃন্দ ব্যাকুল আগ্রহে লক্ষ করিবে।"

বন্যার্তদের খেদমতে পূর্ব-পাক জম্‌ঈয়তে আহলে-হাদীছ

পূর্ব-পাক জম্‌ঈয়তে আহলে-হাদীছের বন্যাসাহায্য সমিতির পক্ষ হইতে বিভিন্ন যিলার বন্যার্তদের সহায়তাকল্পে যে খেদমত আনযাম দেওয়া হইয়াছে নিম্নে উহার যিলা ও গ্রামওয়ারী তালিকার অংশ বিশেষ প্রদত্ত হইল :—

যিলা ময়মনসিংহ

সদর মহকুমা

বিনামূল্যে ধান্য বিতরণ : গুয়াডাঙ্গা ॥০ সের, বাবেধরা ॥০ সের। মাত্র ৩৲ টাকা মূল্যে চরনিয়ামত ২৴ মণ, চরবসন্তি ২৴ মণ, ঝাউগড়া ১৴ মণ, রামভদ্রপুর ১৴ মণ, গুয়াডাঙ্গা ২৴ মণ।

জামালপুর মহকুমা

৩৲ টাকা মূল্যে : জামালপুর ৩॥০ মণ, বানিয়াবাজার ২৴ মণ, শ্যামপুর ॥০ সের, শরিফপুর ৩৴ মণ, কেন্দুয়া কালিবাড়ী ২৴ মণ, হাজিপুর ৩॥০ মণ, ফুলারপাড়া ২॥০ মণ, কৃষ্ণপুর ১॥০ মণ, হরিপুর ৩॥০ মণ, চান্দেরহাওড়া মল্লিকপুর ২৴ মণ, ছবিলাপুর ১৴ মণ। বিনামূল্যে : হাজিপুর ৴৫ সের, হরিপুর-চান্দেরহাওড়া ॥৫ সের।

মাদারগঞ্জ থানা : ৩৲ টাকা মূল্যে : চরনগর ৪৴৫ সের, বীরপাকেরদহ ৫৴২॥ সের, চরবাউলা ২৸ মণ, চরপাকেরদহ ১॥০ মণ, বাণীকুঞ্জ ॥০ সের, ফাযিলপুর ১৴ মণ, গাবেরগ্রাম ॥০ সের, চরগোপালপুর, ৸০ সের, অন্যান্য স্থানে—৸২॥ সের।

শরিষাবাড়ী অঞ্চল : বিনামূল্যে :—সাতপোয়া ॥০ সের, আরামনগর ।৫, পুটিয়ারপাড়া ।০, ভোরারবাড়ী ।৫, সোনাকান্দর ।০ সের। ৩৲ টাকা মূল্যে :—সাতপোয়া ৬'৫ সের, চরহাটবাড়ী ৸০ সের, পুটিয়ারপাড়া ১৸০ সের, পাটাবুগা ১।০ সের, সামর্থবাড়ী ২৴৫ সের, কোণাবাড়ী ১৴ মণ, মাইজবাড়ী ।০ সের, বগাড়পাড় ।০ সের, আরামনগর ৩৴ মণ, মোনারপাড়া ১।০ সের, ভোরারবাড়ী ২।০ সের, সাঞ্চার-পাড়া ১৴ মণ, বলাইরদিয়ার ২৸৫ সের, ধানাটা ॥৫, সিঙ্গুয়া ১।০, খাগুরিয়া ১।০, বড়শরা ১।০ সের, বিলবালিয়া ১।০ সের, করগ্রাম ২৸০ সের, পটল ॥০ সের, উচ্চগ্রাম ১৴ মণ, দিঘপাইত ।০ সের, বলদিআটা ॥০ সের, জাঙ্গালিয়া ১।০ সের।

ক্রমশঃ।